এখন ডুয়ার্স

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭। ১২ টাকা

বীণাপাণি কি বনবাসে?

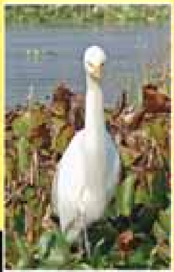

ব্যাঙ্কগুলিকেই পৌঁছতে হবে বাগানে বাগানে

কলেজে কলেজে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞে ধ্বংসের ইঙ্গিত

শীতের সকালে গজলডোবা!

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

সুমধুর সুন্দরবন

প্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য এখানে অনাবিল। ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে থাকা বাতাস, গা-ছমছমে ঘন অরণ্য আর নিজের খেয়ালে বয়ে চলা নিস্তরঙ্গ জলপথ - সব মিলিয়ে সুন্দরবন এখানকার চাকভাঙা মধুর মতোই মিষ্টি এবং মনোহর।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

O&M 069BEN

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

ওয়ার্ডগুলোকে পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি যথেষ্ট সক্রিয়। প্রতিদিন রাস্তা ঝাড় দিয়ে, নিয়মমাফিক ড্রেন থেকে ময়লা তুলে এবং প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিজের পুরো এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি দায়িত্বশীল। আরও অনেক কাজের পরিকল্পনা রয়েছে ভবিষ্যতে। শহরবাসীর সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

তৃতীয় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
মায়ের ভোগে ৪
বিদ্যের আবার কী প্রয়োজন? ৬
বীণাপাণি কি বনবাসে? ৮
ব্যাঙ্কগুলিকেই পৌঁছতে হবে বাগানে বাগানে ১২
পাঠকের কলম
চা-বাগানে আধুনিকতার ছোঁয়া ১৪
দূরবিন
কলেজে কলেজে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ১৭
পর্যটনের ডুয়ার্স
শীতের সকালে গজলডোবা! ২২
ভাঙা আয়না
গাঙ্গুটিয়ার সনৎদা ৩৩
ডুয়ার্সের ডায়েরি
ডুয়ার্সের পিঠেপুলি ৩৫
নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৭
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০
খুচরো ডুয়ার্স ৪১
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
লাল চন্দন নীল ছবি ২৬
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৯
তরাই উৎরাই ৩১
শ্রীমতী ডুয়ার্স
প্রদর্শনী-পিকনিকে জমজমাট ২৪
ডুয়ার্সের ডিশ ২৫

সম্পাদকের ডুয়ার্স

মায়ের ভোগে

মাসখানেক আগে দিল্লির এক মজলিশে 'ভাইসাব আপনার বাড়ি কোথায়' এই প্রশ্নের উত্তরে 'পশ্চিমবঙ্গ' শুনতেই সমবেত আওয়াজ 'চিটফান্ড খ্যাত' এবং তারপরেই 'তা ভাইসাব চিটফান্ডে কত কামালেন?' প্রশ্নে প্রথমে বেশ ঘাবড়ে যেতে হয়েছিল। তারপরে শুনলাম, বঙ্গাল থেকে ধোপদুরস্ত কেউ এলে এমন প্রশ্নেরই মুখে পড়তে হচ্ছে ইদানিং। আবার আপনার চেহারায় যদি দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটে ওঠে তবে তাঁদের ধরন পাল্টায় না, কেবল ভাষা সামান্য পাল্টায়— 'আপনি বঙ্গাল থেকে? তা ভাইসাব চিটফান্ডে কত খোয়ালেন?'

নিজের প্রিয় বাংলার এহেন 'খ্যাতি' শুনলে বিড়ম্বনা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু দিল্লির স্বজাতীয় প্রবাসীরা সান্ত্বনা দেন, আসলে বাঙালিদের এতদিন লেখাপড়ায় এগিয়ে থাকা 'অন্দর সে স্ট্রং' জাত হিসেবেই জানত বাকি দেশ, হিংসে হলেও শ্রদ্ধার একটা জায়গা ছিলই কোথাও, যেটা গত এক দশকে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এতদিন গোটা দেশ 'বিহার কা হো?' বলে যে অবজ্ঞা করত, সেই জায়গাটা এখন নাকি আমরা দখল করতে চলেছি!

আসলে কুয়োর বাইরে না এলে কুয়োটা বাকি দুনিয়ার তুলনায় কতটা ছোট সেই আন্দাজ কোনওদিনই হবে না! এটাই চরম সত্যি। ঠিক যেমন অনুভূতি হয় ডুয়ার্স থেকে কলকাতায় এলে, আমাদের বাংলা নিয়ে সেইরকমই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স হয় অন্য রাজ্যে গেলে। দলে দলে তরুণ রাজ্যের বাইরে যাচ্ছে দিনমজুরির কাজ জোটাতে, দিনরাত ঘাম ঝরিয়ে পোকামাকড়ের মতো দিন কাটিয়ে দুটো রোজগার করে বাড়িতে পাঠাচ্ছে, ন'মাসে ছ'মাসে বাড়ি আসছে দিনকয়েকের ছুটিতে। এতদিন যেমন বিহার থেকে আসা পাড়ার ঠেলাওয়ালা হীরালাল, মুটে রমেশ্বর বা ইস্ত্রিওয়ালা জগনকে দেখেছি, ঠিক তাদের মতোই। বছর কয় আগে ট্রাফিক সিগন্যালে এক আলুথালু বেশের দেহাতি যুবককে দেখেছিলাম কয়েকটা টাকা সাহায্য চাইতে। না ভিক্ষা নয়, বেচারা বিহার থেকে এসেছিল মেহনত করে রোজগার করবে বলে, কিন্তু প্রথম দু'দিনেই বুঝে গিয়েছে, বঙ্গালেই এত বে-রোজগার আছে যে কাম মিলবার আশা নেই। পকেটে যা কয়েকটা টাকা ছিল কিনে খেতে শেষ, গত তিনদিন ধরে না খেয়ে মরার উপক্রম, এখন ট্রেন ভাড়াটা জোগাড় করতে পারলেই দেশে পালাবে, কারণ তার মতে দেশে ফিরে আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকাটাও অনেক ইজ্জতের।

আজ ফুচকাওয়ালা, ছাতুওয়ালা, কলের মিস্ত্রিরা যখন সেই ইজ্জতের সন্ধানেই নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার মতলব করছেন, তখন বং সন্তানদের নিজ-রাজ্য ছেড়ে পালাবার প্ল্যান আরও জোরদার। ঠিক যেমন আদর্শ শিক্ষক তাঁর পুত্র-কন্যাকে বাইরে পাঠাচ্ছেন সামান্য কলেজের ডিগ্রির জন্য। কারণ আমরা যেসব বঙ্গজ এখনও এখানে বসে আমড়া চুষছি, তাদের রাজনীতির বাইরে গিয়ে আর কিছু করবার জো বা যোগ্যতা কোনওটাই নেই। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বং-মসনদে বসে এক প্রতিভাসম্পন্ন দূরদর্শী নেতা ভবিষ্যৎ গণনা করেছিলেন, এই সাধের বঙ্গে যারা শেষমেস টিকে থাকবে তাদের ঝান্ডা ধরা ছাড়া বেঁচে থাকবার রাস্তা থাকবে না।

মসনদে লাল জামা হোক কিম্বা নীল জামা, তাঁর সূচিত সেই ভাগ্যরেখা খণ্ডাবে কে?

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-লুডো-ক্যারাম। পার্টি। গেট টুগেদার। সেমিনার।

বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা

শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

ছ'মাসের এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

বিদ্যের আবার কী প্রয়োজন?

১

সরস্বতী পুজোকে বাঙালির 'ভ্যালেন্টাইন' বলার মূল কারণ 'বিদ্যা'কে সরিয়ে 'প্রেম'কে আনা গেলে বাজারে বিকাবে ভাল। শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান ইত্যাদি শব্দের প্রতি শিক্ষিতজনের শ্রদ্ধাও তলানিতে ঠেকেছে। উক্ত শব্দত্রয়ের পরিবর্তে বোমা, ধর্ষণ, কেলানো প্রভৃতি শব্দ অনেক বেশি সমীহ আদায় করে নেয়। স্রেফ সন্দেহ হলেই যখন মানুষকে ঠেঙিয়ে পরপারে পাঠিয়ে দেওয়া জল-ভাত এবং হবু চিকিৎসকরাও এহেন কর্মে যখন পটুত্ব অর্জন করে ফেলেছেন, তখন সরস্বতী পুজোয় জ্ঞানের বদলে প্রেমের চর্চা, থুড়ি, 'আই লাভ ইউ' চর্চা বেশি জনপ্রিয় হবে, এতে সন্দেহ কী? সবাই জানে যে, যুদ্ধবিমান না কিনে সে টাকা শিক্ষাখাতে দিলে সমাজের কত কাজে লাগত! কিন্তু বিমান কিনতেই হবে, কারণ পরিস্থিতি সেভাবেই ছকে রাখা আছে। যুদ্ধ, হিংস্রতা, ধর্ষণ, হত্যামুখরিত পৃথিবীতে আরেকটা জিনিস চমৎকার চলে। তা হল গদগদে, আলু-ভাতে মার্কা, বাষ্পীয় উচ্ছ্বাসসমন্বিত প্রেম। এই জাতীয় প্রেমে দেখনদারিটা বেশি থাকতে হয়। দেখানোর জন্য একটা জুতসই দিন দরকার ছিল বাঙালির। অতঃপর মিডিয়া দায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সেই দিনটাই হল শুক্লাপঞ্চমী।

তারপর থেকেই সরস্বতী পুজোটা কেমন নেকা নেকা হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানের দেবী তাঁর বিদুষী রূপ হারিয়ে কেমন জানি নেকুসুন্দরীর চেহারা নিয়ে বীণা বাজাচ্ছেন এবং সে বীণা তারহীন। কারণ, বাজানোটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো, দেখো আমি বাজাচ্ছি মাম্মি! পরীক্ষায় ফেল করলে একালে স্কুলে ভাংচুর হয়। অভিভাবকদের দেখা যায় মাধ্যমিকের চোথা সাপ্লাই দিতে। সুতরাং, সরস্বতীর বিদ্যাদায়িনী মূর্তির বাজার উঠবে কীভাবে? 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' কথাটা ফালতু! এই অনুরাগ থাকা মানেই সত্যকে জানার পথে এগিয়ে যাওয়া। সত্য জানলে যে 'ছক' উলটে দেবে গুরু! অতএব, চালাও প্রচার। বিদ্যা, শিক্ষা, জ্ঞান— এই বিষয়গুলোকে তুচ্ছ করতে শেখাও! 'প্রেম' শেখাও। না, না! 'প্রেম' অতি পবিত্র বিষয়। তা মানুষকে সত্যের পথেই নিয়ে যায়। তাই, 'আই লাভ ইউ' শেখাও। এমনভাবে শেখাও, যাতে গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে না শেখে! কচি মনে সবকিছু গভীরভাবে ছাপ ফেলে। কী দরকার সেই মনে জ্ঞানের ছাপ ফেলে দেওয়ার? এর চাইতে শরবিদ্ধ রক্ত-হৃদয়ের ছাপ গভীরভাবে বসিয়ে দেওয়াটা সহজ নয় কি? ধরো, দেশের রাশি রাশি সবুজ মন শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান ভুলে নীল নীল, স্বপ্নিল, ফুল ফুল প্রেম নিয়ে মেতে উঠল! এর পরে দেশটা কী সহজে শাসন করা যাবে, ভাবো তো?

এর পর শুক্লাপঞ্চমীতে 'প্রেম' না হয়ে পারে?

২

সরস্বতী পুজোর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক সব চাইতে বেশি। এ পুজো আসলে তাদেরই। এদের সিংহভাগই অপ্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং এই পুজোকে বাঙালির ভ্যালেন্টাইন বলাটা কেবল আদিখ্যেতা নয়, সাংঘাতিক অপরাধ। পুজো-উৎসব উপলক্ষে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার একটা সুযোগ তৈরি হয়। ছাত্ররা সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছাত্রীদের স্কুলে ঢুকতে পারে। ছাত্রীরাও পুজো দেখতে আসতে পারে 'বয়েজ' স্কুলে। এর মধ্যে অবশ্যই রোমাঞ্চ আছে। উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারা পুজোর উদ্যোক্তা হিসেবে বাড়তি কিছু রোমাঞ্চ লাভ করে থাকে। এর বাইরে পাড়ার পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থেকে লাভ করা যায় বিশেষ কিছু আনন্দ, যা পুরোপুরি নারীবর্জিত। ইদানীং শহরে 'পাড়া' ব্যাপারটা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে পাড়ার পুজো ক্রমে বিরল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, যখন এই পুজোগুলি মহোৎসাহে সাধিত হত, তখন সেসব উদ্যোগের পিছনে 'ভ্যালেন্টাইন' জাতীয় অনুপ্রেরণার ভূমিকা ছিল শূন্য। উদ্যোক্তাগণ প্রায় সকলেই ছিল ছাত্র। কোনও কোনও ক্লাব অবশ্য

‘বাণীবন্দনা’য় বড়সড়ো পরিকল্পনা করত, কিন্তু সেসবই ছিল ‘পূজা’। ফুর্তি অবশ্যই ছিল, কিন্তু ভ্যালেন্টাইন ছিল না।

সবাই জানেন যে, শুক্লাপঞ্চমীর সকালে বালিকা-কিশোরীর দল শাড়ি পরে জনপদের পথ আলো করে ঘুরে বেড়ায়। এই দিন স্কুলে গেলে ইউনিফর্ম পরাটা বাধ্য নয়। ছাত্ররা ধুতি পরার প্রতি আগ্রহ না দেখালেও শাড়ির প্রতি ছাত্রীদের প্রবল অনুরাগ সহজেই অনুমান করতে পারি। পুজোর মতো কাজে মেয়েদের শাড়ি পরিহিত অবস্থায় যোগদান করাটা সমাজের কাছে প্রার্থিত। এর সঙ্গে প্রেমের যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইলে গায়ের জোরেই করতে হয়। প্রেম বিষয়ে যাঁদের তিলমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, বছরের যে কোনও দিনে সেটা হয়ে যেতে পারে। যাঁরা বলেন যে, সরস্বতী পুজোর দিন বহু বহু প্রেমের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তাঁদের হিন্দি সিনেমার বাইরে প্রেম বিষয়ক কোনও ধারণা নেই। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে কেউ না কেউ প্রেমে পড়ছে। সরস্বতী পুজোর দিনও পড়ে। দুর্গা পুজোর অষ্টমীতেও পড়ে। পয়লা বৈশাখেও। কিন্তু দুর্গোৎসবের দিনটিকে ভ্যালেন্টাইন বানাতে চাইল প্রচুর হল্লা উঠবে, কারণ সেটা কেবল ছাত্রছাত্রীদের নয়। কাজেই সরস্বতী পুজো হয়ে গেল উপযুক্ত টার্গেট।

৩

আমাদের নাইন বুলেট ক্লাবের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিল যে, এবার মাটির বদলে অন্য কিছু দিয়ে ঠাকুর বানিয়ে চমকে দিতে হবে। সে সময় বহু কিছু দিয়ে সরস্বতীপ্রতিমা তৈরি করা হত। অত জিনিস পতঞ্জলিও বানায় না। প্রথমে ঠিক হল, খই আর হলুদের ঠাকুর হবে। কিন্তু গোটা হলুদের বাজেট শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ঠিক করা হল, প্রতিমা হবে সাবানের। মানে, বাবু সাবানের। ‘বাবু’ হল অধুনালুপ্ত লোকাল মেড কাপড় কাচার সাবান। মেটে হলুদ রঙের চৌকো মোড়কহীন সাবান একদা শহরে দেদার বিক্রি হত। দামে সানলাইটের অর্ধেকের কম। এবার বাজেটটা হল স্বস্তিদায়ক। তারপর কালাদের বাড়ির দেয়াল চুনকাম করে রবিন ব্লু-র বাক্স কিনে জলে গুলে পাটকাঠির ডগায় তুলো পেঁচিয়ে বেশ কায়দা করে লেখা হল— বিশেষ আকর্ষণ। সাবানের প্রতিমা। পরিচালনায় নাইন বুলেট। সাদা রঙের দেয়ালখণ্ডে নীল দিয়ে সেই লেখা দেখে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নীল-সাদা তখন পলিটিক্যাল হয়নি।

এলাকার মুনিয়াদা, যিনি আয়নার উপরে কাচের চুড়ির রঙিন টুকরো দিয়ে কালী ঠাকুর বানিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁকে সাবান পৌঁছে দেওয়া হল। তিনি কাঠের চৌকো টুকরোর উপরে সাবান লেপে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে সে প্রতিমা বানিয়েছিলেন। পুজোর দিন প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল। বিকেল থেকেই আলো জ্বালিয়ে সেজেগুজে সাবানের প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে মহিলা দর্শকদের জন্য, বিশেষ করে বালিকাদের জন্য। ফাঁকে ফাঁকে সাইকেল নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়গুলির ঠাকুরও দেখে এসেছি। পাড়ার পুজোর এটাই ছিল ফি-বছরের রুটিন। সাবান ছেড়ে দেবী পুনরায় মৃন্ময়ী হয়েছিলেন। এ ছাড়া বাকি ব্যাপারটা ছিল একই রকম। পুজো দেখতে যাওয়ার ছলে প্রেমিক-প্রেমিকারা অবশ্যই নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করত — কিন্তু আগেই বলেছি যে, ওটা পয়লা বৈশাখেও হত, রথের দিনেও হত। কোনও উৎসব হলে সেই উপলক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকা সমবেত হবে বা হতে চেষ্টা করবে— এটা সারা পৃথিবীতে সত্যি।

ছাত্রজীবনে ভরপুর রোমাঞ্চ ছিল সরস্বতী পুজোয়। রোমাঞ্চ আর প্রেম এক নয়। প্রতিটি উৎসব, অনুষ্ঠান, পুজো, ইদ,

> প্রেম বিষয়ে যাঁদের তিলমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে, বছরের যে কোনও দিনে সেটা হয়ে যেতে পারে। যাঁরা বলেন যে, সরস্বতী পুজোর দিন বহু বহু প্রেমের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়, তাঁদের হিন্দি সিনেমার বাইরে প্রেম বিষয়ক কোনও ধারণা নেই।

বড়দিন, সম্মিলন পড়ুয়া জীবনে হরেক রোমাঞ্চ উপহার দিয়ে যায়। তার কোনও কোনওটা আসে প্রেম থেকে। কিন্তু কাঁচা বয়সে প্রেম ছাড়া আর কোনও রোমাঞ্চ না থাকলে তো ভারী বিপদ!

কিন্তু এসব জ্ঞানের কথা। কমবয়সিদের রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে প্রেম-প্রেম খেলার ময়দানে নামিয়ে দিতে পারলে কত্ত রঙিন জিনিস সহজে বেচে ফেলা যাবে! সাহেবদের ভ্যালেন্টাইন ডে আছে। অতএব আমাদেরও একটা লাগবে। ফলত, বাগ্‌দেবী হয়ে গেলেন কামদেবী। প্রেম ব্যাপারটা জীবনের সমান্তরালে ফল্গুধারাতুল্য প্রবাহিত হয়। কিন্তু প্রতিদিন বেঁচে থাকার পরেও যদি কেউ বলে যে, এসো। একটা ‘বেঁচে থাকি দিবস’ পালন করি, তবে খুব বিপদ! বস্তুত, জ্ঞান খুব খারাপ জিনিস। কেউ এটা অর্জন করে ফেললে অপ্রীতিকর প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। অস্বস্তি হয়। বুঝতে পারি যে, ধরা পড়ে যাব। তাই প্রেমের দিকে ঠেলে দিই। জ্ঞানহীন প্রেম। নির্বোধের মতো প্রেমে পড়ুক সব! সংকট জারি থাকুক।

অতএব, হ্যাপি বাঙালি ভ্যালেন্টাইন’স ডে। বাচ্চারা! যাও! বাড়ি থেকে যেনতেন প্রকারেণ বাইক আর শ্লেটাকৃতি মোবাইল আদায় করো। ধুন্ধুমার পরিধেয় ধারণ করে রাস্তায় নেমে পড়ো। তোমাদের জগৎ কেবল প্রেমময়। আগামী দিনের বালক-বালিকারা নিশ্চিত থাকো যে, সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে হালের গদগদ প্রেমোচ্ছ্বাসের কারণে অচিরেই বিদ্যাদেবী পরিণত হবেন কামদেবীতে। বই-পুস্তকের বদলে দেবীর চরণে অর্পিত হবে মোবাইল, যার মধ্যে প্রিয় মানুষের ছবি আর বার্তা রাখা। হাঁসের ঠোঁটে ধরিয়ে দেওয়া হবে কামশাস্ত্র। লেখা হবে নতুন মন্ত্র— ‘কিউপিড-কন্ডোম রঞ্জিত হস্তে’।

মিডিয়া-সিরিয়াল-বলিউড তোমার নিয়তি।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

রকেট সায়েন্সের যুগেও দেবতাদের মার্কেট যথেষ্ট রমরমা মানতেই হবে। দেবতারাও নাকি ভীষণ খুশি এতে। কিন্তু একমাত্র বোধহয় সরস্বতী দেবীরই বাজার আজকাল একটু ঢিলে। কারণ আমজনতার দরবারে 'নেকাপরা' এখন আর কদর পায় না। ইস্কুলের 'মাস্টর'রা রাজনীতি করে আর মিডডে মিল খেয়ে আর 'সময়' পান না। কলেজের 'মাস্টর'রা আগাগোড়াই পালিয়ে বেড়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাস্টর'রা গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আর অধ্যক্ষ-উপাচার্যরা হয় লোকাল নেতাদের হাতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব কিংবা ছাত্রনেতাদের হাতে জামার কলার বন্ধক দিয়ে চাকরি করছেন। অতএব বেচারা বীণাপাণি মা বিনা কদরে আজ বনবাসযাত্রার পথে, স্বর্গে ফিরে যাওয়াটাও তো প্রেস্টিজের ব্যাপার!

বীণাপাণি কি বনবাসে?

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে এল ছেলেটা। দোকানে আগে থেকেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম সরস্বতী পুজোর জিনিস কিনব বলে। দোকানের বয়স্ক ভদ্রলোক শেষ শীতে গলদঘর্ম। কাউন্টারের সামনে অন্তত জনা বিশেক লোকের সঙ্গে চেঁচামেচি। সকলেরই প্রথমে জিনিস চাই। এটা যে শর্টকাটের যুগ, ভদ্রলোক বিলক্ষণ জানেন এবং মানেন। তাই নতুন পন্থা অবলম্বন করেছেন জেট স্পিডে কাজ সারবেন বলে। বড় বড় মন্দিরে পুজো দেওয়ার সিস্টেম যেমন অনেকটা সেরকম। প্যাকেজ সিস্টেম। বাগ্‌দেবীর আরাধনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জামকে একত্রিত করে ক্যারিব্যাগবন্দি করে পার ক্যারিব্যাগ পঞ্চাশ টাকা করে বেচে চলেছেন। এক্সট্রা কিছু লাগালে তার এক্সট্রা মূল্য। মা সরস্বতী কার পুজো নেবেন না নেবেন, তাতে তাঁর নিজস্ব মতামত নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও এ ব্যাপারে তাঁর কোনও স্বাধীনতা নেই। বাক্‌স্বাধীনতা কেবল আমাদের। যে ছেলেটির কথা বলছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে আমার ঘাড়ের কাছে। সঙ্গে আরও দুই বন্ধু। একে অপরকে দুই অক্ষরের ব-যুক্ত বিজাতীয় শব্দে সম্বোধন করছে অনবরত। অস্বস্তি হচ্ছিল। হোক। নিজেকে সান্ত্বনা দিই এই ভেবে, এরাও তো মায়েরই সন্তান। বিদ্যের ধরনটা পালটে গিয়েছে একটু। কিছু নতুন শব্দ বাংলা অভিধানে স্থান পেয়েছে মাত্র। এ আর এমন কী। বেশ কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা সরস্বতী পুজো করবে?' উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, করব। ওই তো ওই মোড়ে। কেন, আপনার কোনও আপত্তি আছে ম্যাডাম?' আমি থতমত খেয়ে বলে উঠি, 'না না, আপত্তি থাকবে কেন?' আমি জানতে চাইলাম, 'তোমরা কী পড়ো?' বলল, 'আমি নাইনে, ও টেনে।' আমি ঢোক গিলে বললাম, 'স্কুলে পুজো করো না?' 'স্কুলে?' বলে, এ ওর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যেন মনে হল, আমি কোনও উদ্ভট প্রশ্ন করে ফেলেছি, যা আমার করাই উচিত হয়নি। পাশ কাটিয়ে আমার জিনিস বগলদাবা করে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসি। নিজেদের সময়কার এই বয়সি ছেলেদের চেহারাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। অচেনা-অজানা বড়দের দেখলে ওরা সিগারেট লুকিয়ে ফেলত। নিজেদের ঠেকে নিজেদের মধ্যে গালাগালি করলেও কোনও দিন রাস্তায় জনসমক্ষে এত কুশ্রাব্য কথাবার্তা বলতে শুনিনি। আসলে যুগবদলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হয় আমাদের। না পারলেই কষ্ট, অস্বস্তি, অসুবিধা। সকলের কাছেই তার নিজের কম বয়সের সময়টাই শ্রেষ্ঠ।

সরস্বতী পুজো আমাদের স্কুল-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এমন একটা অনুষ্ঠান, যার স্মৃতি বৃদ্ধ বয়সেও অমলিন থেকে যায়। সরস্বতী পুজো চিরকালই আমাদের কিশোর বয়সে পাওয়া একটা দিনের স্বাধীন হবার উৎসব। পুজোর দু'দিন আগে স্কুলে স্কুলে নেমন্তন্নপত্র বিলি করতে যেতাম দল বেঁধে। সারাটা রাস্তা স্কুল ইউনিফর্মে পায়ে হেঁটে বুক চিতিয়ে চলতাম। ওই বয়সে ওটাই মনে হত অনেক কিছু পেয়ে গিয়েছি। আগের দিন দুপুরবেলা স্কুলের টিচারদের সঙ্গে প্রতিমা আনতে যাওয়া, মণ্ডপ সাজানো, আলপনা দেওয়া— কত কাজ যে একসঙ্গে সকলে মিলে করতাম! আর তার মধ্যে কী যে আনন্দ ছিল! পুজোর দিন, অথবা কোনও কোনও স্কুলে অন্য কোনও দিন চলত খাওয়াদাওয়া। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধন দেখতে পেতাম সে সময়, যার আজ বড় অভাব। স্কুল ছিল আমাদের বড্ড আকর্ষণের জায়গা। সে কারণে স্কুলের সেই ক্লাস

ওয়ানের বন্ধুত্বের গিঁট আজও একই রকম শক্ত।

বসন্তকাল বলেই কিনা কে জানে, সকলের মধ্যেই একটা রোমান্টিক সুরও কিন্তু বাজে এ সময়টাতে। ফাগুন-ফুলের আনন্দে একটা আবেশ-লাগা অনুভূতি। সেই দিনটায় থাকত বাড়ি থেকেও একটু ঢিলেঢালা ব্যবহার। ছোট্টবেলার কথা মনে নেই। এইট, নাইন, টেন, যখন ডানাটা গজানো শুরু করে একটু একটু করে মেলে ধরার সাহস অর্জন করছি, তেমন সময় এই একটা দিনের ছাড়কেই যথেষ্ট মনে হত। আমাদের মধ্যে যাদের বয়ফ্রেন্ড তৈরি হয়েছে, তারাও এই দিনটা একটু সাহস করে সামনাসামনি দেখা করার সুযোগ পেত। আর সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাবে না এমন আহাম্মক কেউ নয়। আমরা বন্ধুরাই একে অন্যেকে সাহায্য করে দিতাম। আবার পাশাপাশি সেই দিন সকাল থেকে স্কুলের চত্বরে শিক্ষিকাদের সঙ্গেও সময় কাটাতে খুব ভাল লাগত। তাঁরাও কেমন যেন বন্ধু হয়ে যেতেন। ঠাট্টা করতেন, মজা করতেন, এমনকি প্রয়োজনে পরামর্শও দিতেন। এই পুরো ব্যাপারটাতে আমাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও জন্মে যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সরস্বতী পুজোর ঐতিহ্য ডুয়ার্স বাংলার শিক্ষাঙ্গন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশই। কোথা থেকে কবে যে সরস্বতী পুজো 'বাঙালির ভ্যালেন্টাইন'স ডে'তে পরিণত হল কে জানে। বাজারি মিডিয়ার প্রচারের সেই শিকড় খুঁজতে না গিয়ে বরং এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার পথটা ভাবাই বোধহয় শ্রেয়। সরস্বতী যদি তাঁর কুমারীত্ব বজায় রেখেও তাঁর স্নেহের আর ভালবাসার স্পর্শে আমাদের সকলের কাছে পূজ্য হতে পারেন তাহলে আমরা কেন তাঁকে পুজো করার দিনটিকে এভাবে জোরজবরদস্তি 'ভ্যালেন্টাইন'স ডে'তে পরিণত করার অপচেষ্টা করছি? বরং এমনই কি ভাবনার কথা নয় যে, পুরুষবিহীন একলা এক নারীরও শক্তি কত। আসলে আমরা বাঙালিরা একটু পরচাটা টাইপ। ইংরিজিয়ানায় যা কিছুই হল, অমনি টেনে আনি আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে। আজকাল 'শুভ নববর্ষ'র জায়গায় এসএমএস পাই 'হ্যাপি ১লা বৈশাখ'। দেওয়ালিতেও তা-ই, হোলিতেও তা-ই। 'শুভ জন্মদিন' তো বিদায় নিয়েছে কোন কালেই। সম্ভবত 'হ্যাপি বার্থডে'ই পাইয়োনিয়ার। আসলে বাঙালিরা বাঙালিত্ব খুইয়ে একটা অন্যরকম আনন্দের স্বাদ পায়। খোয়াতে খোয়াতে আজ যখন একটা ক্রাইসিসের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা ভাষাসহ তার সংস্কৃতির একটা বড় অংশ, তখন বাঙালিরাই আবার প্রতিবাদে সোচ্চার।

ইংলিশ মিডিয়ামের ধাক্কা!

প্রথমে ইংরেজি তুলে দেওয়া এবং তারপর ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া— প্রজন্মের পর প্রজন্ম বৃহদংশ মানুষকে ভবিষ্যতের লড়াইয়ে পঙ্গু করে দেওয়ার 'বিপ্লবী' অভিসন্ধির খেসারত এখন দিচ্ছি আমরা। এক কথায় ব্যাখ্যা করলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রতুলবাবু। যার বিশ্লেষণমূলক সমর্থন পাওয়া গেল আরও অনেকেরই কথায়।

পঠনপাঠনের পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর। ইংরেজি না শিখলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার— এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সমাজের প্রথম-দ্বিতীয় সারির পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে, বাংলাকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা হয়ে পড়ছে বাংলা-সংস্কৃতিবিমুখ। কারণ, ইংলিশ মিডিয়াম ঘরানাই তাদের ভাবনাচিন্তাকে বাধ্য করছে মুখ ফিরিয়ে নিতে। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, বাংলার গৌরবের কথা, নানান বীরবিক্রমের কাহিনি, মহাপুরুষদের বাণী, এমনকি পঞ্চতন্ত্র কিংবা ঈশপের গল্প আমাদের শরীর ও মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে গেঁথে থাকত এতকাল, তার মূল ভিতটা কিন্তু তৈরি হত স্কুল স্তরেই। এখনকার ইংরেজি মাধ্যমের বাঙালি বাচ্চারা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কথা জানেই না। তারা হ্যারি পটার, ডোরেমন— এসবেই অভ্যস্ত বেশি। ইংরেজি স্কুলের সিলেবাসের মধ্যেও আমাদের দেশের ঐতিহ্যের কথা পাওয়াই যায় না প্রায়। যা পাওয়া যায় তা অতি সামান্য। ফলে এইসব ছেলেপুলে আমাদের পুরনো ঐতিহ্যের কথা জানতেও পারে না। ইংরেজি মাধ্যমের বহু স্কুল যেহেতু খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত, সেখানকার ছাত্ররা, যারা উচ্চবিত্ত ঘর থেকে পড়তে আসে, তারা সরস্বতী পুজোর আবেগ-উত্তেজনা উপলব্ধিই করতে পারে না কোনও দিন। ডুয়ার্সের চালচিত্রে ধরা পড়ছে এসব। এখনকার পঠনপাঠন নিয়ে সচেতন শিক্ষক-শিক্ষিকারা যা বললেন, তাতে পরিবর্তনের ছবিটা স্পষ্ট। এবং সরস্বতী যে আক্ষরিক অর্থেই বনবাসে যেতে বসেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। লাটাগুড়ি হাই স্কুলের অর্চিতা সিহি জানালেন, বাংলা মাধ্যম তথা সরকারি স্কুলগুলোতে পরিকাঠামোর বড় অভাব। বিভিন্ন খাতে টাকা আসছে ঠিকঠাক, কিন্তু স্কুলের জন্য যেটা সবচাইতে জরুরি, সেই শিক্ষকের সংখ্যাতেই অনেক ঘাটতি। তাঁদের স্কুলেই তো দু'হাজারের মতো স্টুডেন্ট, অথচ সেই অনুপাতে শিক্ষক অনেক কম। যার ফলে সিলেবাস শেষ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারপর আবার পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ায় বাড়িতে কোনও পড়াশোনা না করে, কোনও নম্বর না পেয়েও দিব্যি পরের ক্লাসে উঠে যাচ্ছে বিনা বাধায়। এই চিত্র সাধারণ এবং নিম্নমানের বেশির ভাগ স্কুলেই। মিডডে মিলের জন্য স্কুলে উপস্থিতির হার ভাল হলেও সরস্বতী কিন্তু ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে। সব্যসাচী দত্ত রানির কামাত প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠল তাঁদের স্কুলের ভাল দিকের কথা। সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের অসুবিধের কথাও। যারা বাড়িতে ছিঁটেফোটাও পড়াশোনার সাহায্য পায় না, পুরোটাই নির্ভর করে থাকে স্কুলের শিক্ষকের উপর। সেদিক থেকে শিক্ষকদের দায়িত্ব পুরোটাই। প্রাইমারি স্কুলের বেঞ্চ তুলে দেওয়াটা সরকারের বিবেচনা করে দেখার উপর জোর দিলেন তিনি। মেঝেতে পাটি পেতে বসতে গিয়ে বিশেষত শীতে এবং বর্ষায় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে শিশুদের। কষ্ট পাচ্ছে তারা। মিডডে মিলের প্রকল্পটি অত্যন্ত ভাল হলেও কোনও

ডাইনিং-এর ব্যবস্থা না থাকায় একটি শিশুর পাশে বসে আছে একটি পথ-কুকুর, এ দৃশ্য গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলোতে আকছার চোখে পড়ে। শিশুটির পক্ষে এই পরিবেশ একেবারেই অস্বাস্থ্যকর।

বিদ্যালয় প্রধানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

কোচবিহার সুনীতি অ্যাকাডেমির হেড মিস্ট্রেস মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এসব নিয়েই। তিনি বললেন, স্কুলগুলোর অনেকটাই নির্ভর করে হেড অব দি ইনস্টিটিউটের উপর। স্কুলে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া তৈরি করা, ফুলগাছ লাগানো, পড়াশোনার দিকটা দেখা ইত্যাদি সবকিছুর দিকে নজর দিলে কিছুটা ভাল ফল তো পাওয়াই যায়। তবে হ্যাঁ, প্রজন্মের তফাতে অনেক কিছু পালটে গিয়েছে আজকাল। সরস্বতী পুজোর দিন সেই যে একটা মজা ছিল, এখনও যে পুরোপুরি নেই তা বলব না, তবে পালটে গিয়েছে অনেকটাই। সকলের হাতে হাতে মোবাইল। ফলে কে কী করছে না করছে, বোঝার উপায় নেই। এসবের ভাল দিক যেমন আছে, মন্দও তো আছে। মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে অনেকাংশে। সব ক্ষেত্রেই কিন্তু স্কুল দায়ী নয়। খগেন হাট নাথুনি সিং হাই স্কুলের শিক্ষিকা গীর্বানীর বক্তব্যে সন্তুষ্টির উষ্ণতা। এথেলবাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটার ভিতরে এই স্কুল। হেড মিস্ট্রেস খুবই ভাল মানুষ। ফলে স্কুলে একটি সহযোগিতার বাতাবরণ। মাধ্যমিকের আগে যে পড়ুয়ার যে বিষয়ে ঘাটতি আছে তা মিটিয়ে দেবার জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের কথার সঙ্গে মিল পেলাম কিছুটা। হেড অব দি ইনস্টিটিউশনের সদিচ্ছা থাকলে অনেকটাই ভাল করা যায়। যেমনভাবে নজির গড়েছেন ধূপগুড়ির পূর্ব মল্লিকপাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিতকুমার দে। তাঁর স্কুলের চিত্রটি এমনই, যেন বলছে, ইচ্ছে থাকলে কী করা যায় দেখুন সবাই। সমস্যা কি সেখানেও নেই? আছে। তবে সেগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাটাই আসল কথা। কিন্তু হতাশা আসে সেখানে, যখন দেখা যায় ডুয়ার্সে হাজার হাজার বিদ্যালয় গজিয়ে ওঠা সত্ত্বেও সেসব বিদ্যালয়ের না আছে কোনও সঠিক বৌদ্ধিক বিকাশসম্পন্ন দক্ষ পরিচালক, না আছে সরকারি তরফে পরিকাঠামোর খামতিপূরণের কোনও সদিচ্ছা। ফলে সরস্বতী বনবাসে বইকি।

হীরক রাজার দেশে সন্ত্রস্ত সরস্বতী!

বিধি 'বাম' কি আর আজকের কথা? এই 'পরম্পরা' চলে আসছে গত চার দশক ধরে! ফোড়ন কাটলেন পরিচিত এক দাদা। রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে যাঁর স্কুলের চাকরিটা হব হব করেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। (তাঁর ভাষায়, মিছিলে যোগ না দেওয়ায় এই ফল।) স্বভাবতই প্রাইভেট টিউশনিতেই (তাঁর ভাষায় টোলশিল্প) জীবিকার পথ বেছে নিতে হয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যাই তুলে দিলাম।

সরস্বতী ভীত। সন্ত্রস্ত। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ভয়াবহ রূপ তাঁর অজানা। অধিষ্ঠান টলে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি নির্বাসন নেবেন না তো কী! রাজনীতির শিকারে কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা, তার ভূরি ভূরি উদাহরণ চোখের সামনে ধরা পড়ছে প্রতিনিয়ত। শাসকদলের ক্ষমতাসীনদের দাপটে প্রায় 'হীরক রাজার দেশে'র মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রথমে 'মগজ ধোলাই'-এর চেষ্টা, শিক্ষা সেলে জয়েন করতে হবে, কাজ না হলে হুমকি। তাতেও কাজ না হলে শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনাগন্ডা আটকে দেওয়া। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির প্রকোপ বেড়ে গেলে তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপে পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের উপর। কোনও কোনও স্কুলে এমনও হয়েছে, সাইকেল বিলির সময় বড় বড় নেতা-মন্ত্রীর কেউ কেউ স্কুলের মাঠ ভরতি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে মন্ত্র পড়িয়েছেন, 'বলো, হীরকের রাজা ভগবান।' তারপর 'হাততালি দাও, হাততালি দাও।' সমস্বরে অবোধ শিশু-কিশোররা গলা মেলাল। হাততালি দিল। নেতারা মহাখুশি। সম্ভবত এতে তাঁদের টিআরপি ভাল হল। শিক্ষাজগতের মধ্যে এমন রাজনীতির চিত্র ডুয়ার্সের বহু স্কুলেই। দুর্দশা সাদাসিধে শিশু-কিশোরদের। দুর্দশা তাদের অভিভাবকদের। অবশেষে দুর্দশাটা যখন ধসের মতো নামতে শুরু করল, হুড়মুড় করে সেটা পড়ল এসে সমাজের উপর।

শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতি কখনও কখনও পরিবর্তিত হয় ব্যক্তিগত আক্রোশে, যার প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপরে। শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা শিক্ষকদের

ব্যবহার, চলনবলনই আলাদা। অন্তর্নিহিত রেষারেষিটা কীরকমভাবে ছাত্রদের উপরে পড়ে, তার একটা সত্য উদাহরণ দিই। রামবাবু বিশেষ কোনও কারণে দু'-একদিন স্কুলে দেরিতে পৌঁছেছেন। শ্যামবাবু লক্ষ করেছেন সেটা। ব্যাস, গ্রামের চায়ের দোকানে একটু বাঁকা চোখে জাস্ট ছুড়ে দিলেন কথাটা। কিছু অভিভাবক তো ছিলেনই সেখানে। রামের বিরুদ্ধে গুনগুন শুরু হল। রামবাবু ব্যাপারটা আঁচ করলেন। মনে মনে ভাবলেন, আমার পিছনে লাগা? একদিন শ্যামের অনুপস্থিতিতে তাঁর ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের বললেন, কী রে, দেখি তো শ্যাম স্যার কী পড়ান। তাদের বইটা নিয়ে এমন এমন প্রশ্ন করলেন এবং সেই বিষয়ে নিজে পাণ্ডিত্য ফলিয়ে দেখালেন যে ছাত্ররা একটু বিস্মিত। অবশেষে বললেন, শ্যাম স্যার কী পড়ায় তোদের? সব ভুলভাল। ব্যাস, দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে গেল নিষ্পাপ ছাত্রগুলোর মনে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত কখনওই শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে একমত ডুয়ার্সের সমস্ত শিক্ষকমহল। মুখে বললেও কাজে কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না সর্বক্ষেত্রে। রাজনীতির প্রকোপে অশান্তির চরমে পৌঁছে গিয়েছে কলেজের শিক্ষা। কোনও অভিভাবকই কি তাঁর সন্তানকে কলেজে পড়তে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন না? ওটা তো লেখাপড়া করে জীবন গড়ার জায়গা, সেখানে এমন হিংস্র রাজনীতি কেন? আসলে ছাত্রছাত্রীরা যতটা না মনপ্রাণ দিয়ে রাজনীতি করে, তার চাইতে বেশি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাবানদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক চাপ আসে অধ্যক্ষদের মধ্যেও। ইউজিসি-র গাইডলাইনে পঠনপাঠনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গভর্নিং বডিতে থাকা বিভিন্ন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তির চাপে সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধায় পড়তে হয় তাঁদের। অনেক সময়ই নির্দিষ্ট গাইডলাইন মানা সম্ভব হয় না।

কলেজগুলোর থেকে সরস্বতী যে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, তার আরও একটা অতি প্রয়োজনীয় কারণ বলি। ডিগ্রি কোর্সে এক বর্ষ থেকে পরের বর্ষে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ফাইনালের আগে টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়। সেই টেস্ট পরীক্ষার খাতা দেখেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যারা ১৮ শতাংশ নম্বর পেয়েও পাশ করল না, তারাও দেখা গেল টেস্টে উতরে গেল। তাহলে শিক্ষকরা কেনই বা তাঁদের দিনরাত এক করে ভাবনাচিন্তা দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে নম্বরগুলো দিলেন? প্রচুর ছাত্র এইভাবে ফাইনাল অব্দি পৌঁছাল, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল, ফাইনালে কিন্তু তারা পাশ করল না। সিসি ক্যান্ডিডেট হিসেবে রয়ে গেল। টেস্টে তুলে দেওয়াই যদি হবে তাহলে সে পরীক্ষা নেওয়ার মানেই হয় না। কেনই বা তুলে দেওয়া হয়? কারণ, তা না হলে নতুনরা পরের বছর সিট পাবে না। কিন্তু এতে কলেজের মান কোথায় নেমে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখাটাও কি জরুরি নয়? টেস্টে আটকে দিলে অন্তত তারা ফাইনালের জন্য লেখাপড়াটা তো করবে। বহু বছর ধরে এইরকম হওয়ার ফলে রেগুলারের চাইতে সিসি ক্যান্ডিডেটের সংখ্যা প্রচুর বেশি। এতে আখেরে পড়াশোনাটা কি ঠিকঠাক হচ্ছে? হচ্ছে না তো। কথা হচ্ছিল অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তর সঙ্গে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ চাইলে অনেকটাই দমন করতে পারেন। তবে এমনটা অনেক সময়ই হয়, কলেজে বহিরাগতদের প্ররোচনায় বহু ছাত্র রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এমনভাবে, যার ফলে পড়াশোনা থেকে তারা সরে যায় অনেকটাই।

শিক্ষকের গুণমানে পিছিয়ে ডুয়ার্স?

প্রশ্নের উত্তরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ার যে দু'টি অজুহাত মিলল তা বেশ ভাববার বিষয় বইকি!

প্রকৃতপক্ষেই কি ডুয়ার্সের স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান যতটা ভাল হওয়া উচিত, ততটা নেই! গুণী শিক্ষকের তো অভাব নেই! দেখা যায়, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরাই তাঁদের সন্তানদের সাধারণ বিষয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন বাইরে। অথচ এখানেও কিন্তু সংখ্যা এবং গুণাগুণের বিচারে যথেষ্ট ভাল ভাল স্কুল-কলেজ রয়েছে। তাহলে এই বহির্মুখীনতা কেন? এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কম নম্বর পেয়ে বাইরে গিয়ে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না-পারা কি কিছুটা হলেও এর জন্য দায়ী নয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই নম্বর কম দেওয়ার প্রবণতা কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে, এখানে একেবারেই কোনও ভাল ছাত্র নেই? নাকি অন্য কোনও কারণ? আসলে নানান সমস্যা একত্রিত না হলে একটি গুরুতর সমস্যা দানা বাঁধে না। কলেজে রাজনীতি যে ছেলেপুলেদের বিমুখ করছে এবং সেখানে যে দাদাগিরির গল্প দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, সে বিষয়ে মুখ খুলতে চাইলেন না অনেক অধ্যাপক। বললেন, একটা ভয় তো কাজ করেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক জুজুর ভয়? প্রতিবাদ করতে নাকি সাহস পায় না কেউ। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সৃষ্টি হচ্ছে না বলেই তো আজ সরস্বতী এমন বিপন্নোন্মুখ।

শ্বেতা সরখেল

বেড়াতে চলুন আন্দামান

গ্রুপ টুর
যাত্রা শুরু
২১ মে ২০১৭
(পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার)
আসন সীমিত

৭ রাত ৮ দিনের প্যাকেজ টুর		
পোর্ট ব্লেয়ার	-	৪ রাত
হ্যাভলক	-	২ রাত
নীল	-	১ রাত

প্যাকেজ রেট
১৭,৮৫০ টাকা (জন প্রতি)
১৬,৯০০ টাকা (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৪,৩০০ টাকা (৫-১১ বছর)
৮,৯০০ টাকা (২-৪ বছর)
(দ্রষ্টব্য: বিমান ভাড়া ব্যতীত প্যাকেজ রেট)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
সাইট সিইং, পরিবার প্রতি ঘর, নন-এসি গাড়ি, খাওয়া (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার), সরকারি বোট, সকল পারমিট

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

এইভাবেই থাকে ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকেরা

ব্যাঙ্কগুলিকেই পৌঁছতে হবে বাগানে বাগানে

মজুরির জন্য লাইনে দাঁড়ানোর সময় কোথায় শ্রমিকের?

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় এই চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **নবম পর্ব**।

বিদায়ী ২০১৬ শেষ হয়েছে পুরনো পাঁচশো এবং হাজারের নোটের সার্জিক্যাল অপারেশনের মাধ্যমে। প্রশংসিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন, ব্যাঙ্ক, বাগিচা কর্তৃপক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, ভারতীয় চা পর্ষদ, টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন-সহ চা শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশাসনিক তৎপরতা। মজুরি সংকট সমাধানকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে এনেছিলাম 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। সরকার তথা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মজুরি সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং পুরনো নোট বাতিল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা না নিলে ডুয়ার্সে যে আগুন জ্বলত, সে কথাও উল্লেখ করেছিলাম। ১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা পরবর্তীকালে এই এক মাসে মজুরি সংক্রান্ত সমস্যার সার্জিক্যাল অপারেশনের মূল দিকটি তুলে ধরার আন্তরিক প্রয়াস নিয়েই পাঠকবর্গের কাছে ডুয়ার্সের সর্ববৃহৎ শিল্পের মজুরি সংক্রান্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরার লক্ষ্যে কলম ধরলাম। পাঠকবর্গই বিচার করুন, মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত এবং নতুন ২,০০০ টাকার নোট আমদানি বা 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র স্লোগান বাগিচা শ্রমিকদের কাছে কী বার্তা বহন করে আনল। তথ্য সংগ্রহ করতে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে পাওয়া সরকারি ছুটিকে কাজে লাগিয়ে শিলিগুড়ি থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষায় বার হলাম। ওদলাবাড়িতে অপেক্ষায় ছিল আমার সফরসঙ্গী মালবাজারের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সমাজকর্মী অনিমেষ মুখার্জি। যাব মাদারিহাট হয়ে আলিপুরদুয়ার। কারণ আমাদের কাছে খবর ছিল, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মজুরি দেওয়া শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার দু'টি চা-বাগিচায়।

পুরনো বছরেই আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের মাঝেরডাবরি চা-বাগিচার প্রায় ৭০০ শ্রমিক ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় বায়োমেট্রিক যন্ত্রে আঙুলের ছাপ দিয়ে মজুরি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের রওনা হতে দেরি হবার ফলে এবং মাঝখানে মাদারিহাটের বিড়লা গ্রুপের অন্তর্গত জয়শ্রী টি লিমিটেডের আর্যমান চা-বাগানে ঢোকার ফলে মাঝেরডাবরি চা-বাগিচার শ্রমিকদের বায়োমেট্রিক যন্ত্রে আঙুলের ছাপ দিয়ে তাঁদের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্য মজুরির টাকা তোলার দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পারলাম না। তাই তথ্য জোগাড় করেই ক্ষান্ত হতে হল। মাঝেরডাবরি বাগান কর্তৃপক্ষ জানালেন, পাকাপাকিভাবে মজুরি প্রদানের কাউন্টার হিসেবে আলাদা একটি ঘর বেছে নেওয়া হয়েছে। সেখানে যন্ত্র নিয়ে একজন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মজুরির দিনগুলিতে উপস্থিত থাকবেন, এবং ওই ব্যবস্থা সারা বছরই চালু থাকবে। অনলাইন ব্যবস্থার এই নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাগানের শ্রমিকরা। মাঝেরডাবরি চা-বাগানের ম্যানেজার চঞ্চল ধর জানালেন, বাগানটিতে কোনও মজুরি বকেয়া পড়ে নেই। পাশাপাশি ডিসেম্বরের শেষ পাক্ষিক সপ্তাহে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় মাদারিহাট ব্লকের আর্যমান চা-বাগানে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়। আর্যমান চা-বাগানের ম্যানেজার সন্দীপ নাগপাল বলেন, আর্যমান বাগানে কোনও বকেয়া থাকল না। প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমাদের কাছে একটা বিষয় প্রতীয়মান হল যে, মাঝেরডাবরি এবং আর্যমানের মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা শিল্পবান্ধব। অন্য বাগানগুলিতেও একইভাবে যাতে মজুরি প্রদান সম্ভব হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় চা-বাগিচা কর্তৃপক্ষ বাস্তবসম্মত মজুরি প্রদান পরিকল্পনা তো করতেই পারে। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাঙ্ক কর্মীদের যাতায়াত ও গাড়ি ভাড়ার খরচসহ বাগানে পাকাপাকিভাবে কাউন্টারের ব্যবস্থা করলে শ্রমিক-কর্মচারীদের হয়রানি অনেক কমবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এসবিআই-এর ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্ক নিয়ে চা-বাগিচাগুলিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন সার্জিক্যাল অপারেশনের পরবর্তীকালে। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেন, যে সমস্ত শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আধার কার্ডের লিঙ্ক রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁরাই ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্ক থেকে নগদ অর্থ তুলতে পারছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুরি প্রদান সংক্রান্ত নয়া নির্দেশিকায় উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচাগুলিতে মজুরি সংকটের ফলে যখন 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠতে শুরু করেছে, সেই সময়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্ক পরিষেবা নিয়ে নোট বাতিলের ১৭ দিনের মাথায় বাগরাকোট বাগানে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎবাবুর নেতৃত্বে ব্যাঙ্কের কর্মীরা। বিশ্বজিৎবাবু জানান, বাগরাকোটে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা থাকার ফলে লাইনে দাঁড়িয়েও ভিড়ের চাপে টাকা তুলতে পারছিলেন না বহু চা শ্রমিক, বিশেষত যাঁরা অশক্ত অথবা বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। শ্রমিকদের বেশির ভাগের ডেবিট কার্ড না থাকার ফলে অর্থাভাবে শ্রমিক পরিবারগুলিতে সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার পূর্বেই সর্বাধিক ২,০০০ টাকা নগদ পেয়ে স্বস্তি ফিরেছিল চা শ্রমিক পরিবারগুলিতে। আশা ওঁরাও, শান্তি ভগৎ, বীরেন্দ্র মাহালিদের মুখে এভাবেই হাসি ফুটিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

চা শ্রমিকদের মজুরি সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়নি নোট বাতিলের এতদিন বাদেও। গত মাসে যখন ক্ষেত্রসমীক্ষায় বার হয়েছিলাম, তখন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু চা-বাগানে শ্রমিকরা সাপ্তাহিক বকেয়া মজুরি পেলেও উত্তরবঙ্গের ৩০০টি চা-বাগিচার অধিকাংশ জায়গাতেই মজুরি হয়নি। আলিপুরদুয়ার জেলার ৭টি, দার্জিলিং জেলার ৩১টি চা-বাগিচায় মজুরি দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার জেলার একটি চা-বাগানেও শ্রমিকরা মজুরি হাতে পাননি। মাঝেরডাবরি চা-বাগিচার ম্যানেজার চঞ্চল ধর জানিয়েছিলেন, জেলার মাত্র ১০টি বাগানের কর্তৃপক্ষর হাতে জেলা প্রশাসনের তরফে বাগিচা শ্রমিকদের মজুরির টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি উদ্বেগে ছিলেন এ কথা ভেবে যে, বাগিচা শ্রমিকরা যে কোনও সময়ে বিক্ষুব্ধ হলে শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হয়ে যাবে। তবে তাঁর সেই আশঙ্কা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি শেষ পর্যন্ত। সেই সময়ে চা-বাগিচার সঙ্গে জড়িত সকলেই ছিল শঙ্কিত। আলিপুরদুয়ারে পেয়েছিলাম এনইউপিডব্লিউ অর্থাৎ ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কস-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে। তিনি একটিও চা-বাগিচাতে টাকা না আসায় হতাশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, চা-বাগানের হাতে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরির টাকা না পৌঁছানোর বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। সমস্যার বিষয়টি শ্রমিকদের বোঝাতে হবে। চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক জিয়াউল আলম জানিয়েছিলেন অভাবনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির কথা। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা পালন করার কথা ছিল তা কেউই করছে না। জিয়াদার মতে, হাতে গোনা কয়েকটি বাগানে মজুরি দেওয়ার সময়ে শ্রমিকদের ২,০০০ টাকা নোট দেওয়া হয়েছে, যেটা কাম্য ছিল না। বাগানে বাগানে পর্যাপ্ত ব্যাঙ্ক ও এটিএম পরিষেবা চালু হলেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মজুরি প্রদান করা যাবে বলে তাঁর অভিমত।

চা-বাগান মালিকদের অন্যতম সংগঠন ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক সুমন্ত গুহঠাকুরতা নোট বিপর্যয় পরবর্তীকালে শ্রমিকদের ধৈর্যচ্যুতির বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। মজুরি সংক্রান্ত প্রশ্নে ম্যানেজাররা বুঝিয়ে তাঁদেরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে গেলেও উদ্‌বেগ প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছিলেন, কতদিন এই প্রয়াস চালানো যাবে তা নিয়ে তিনি যথেষ্টই সন্দিগ্ধ। ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীও জানিয়েছিলেন, মজুরি দিতে আরও দেরি হলে শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার (টাই) উত্তরবঙ্গের সম্পাদক রাম অবতার শর্মা জানিয়েছিলেন, পর্যায়ক্রমে বাগান কর্তৃপক্ষর হাতে জেলা প্রশাসন পুরনো নোটের বদলে নতুন নোট তুলে দেবে। জানুয়ারির এই শেষ লগ্নে এসে ঠিক এক মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উত্তরের তরাই, ডুয়ার্সের বাগিচাগুলিতে ছোটখাটো দু'-একটি বিক্ষোভ এবং বাগান বন্ধের ঘটনা ছাড়া কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

অন্য দিকে, ৯ নভেম্বর পরবর্তীকালে

চা শ্রমিকদের মজুরি সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়নি নোট বাতিলের এতদিন বাদেও। গত মাসে যখন ক্ষেত্রসমীক্ষায় বার হয়েছিলাম, তখন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু চা-বাগানে শ্রমিকরা সাপ্তাহিক বকেয়া মজুরি পেলেও উত্তরবঙ্গের ৩০০টি চা-বাগিচার অধিকাংশ জায়গাতেই মজুরি হয়নি। আলিপুরদুয়ার জেলার ৭টি, দার্জিলিং জেলার ৩১টি চা-বাগিচায় মজুরি দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

পাহাড় ও তরাই মিলে প্রথম দফায় ৩১টি চা-বাগিচায় মজুরি প্রদান করা হয়েছিল। নোট বাতিল পরবর্তীকালে যে বাগানগুলি প্রথম মজুরি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদেরকেই এই নয়া মজুরি প্রদানব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। দার্জিলিং জেলা প্রশাসন, দার্জিলিঙের লিড ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া খুব ভাল কাজ করেছে। জলপাইগুড়ির লিড ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চিফ ম্যানেজার অনাদি বিশ্বাসের নেতৃত্বে সফ্‌টওয়্যার সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় কাজ সাঙ্গ করে মজুরি প্রদানের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আলিপুরদুয়ার জেলার লিড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তুষারকান্তি রায়ের নেতৃত্বেও আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বাগিচাগুলিতে মজুরি প্রদান বিষয়ক ধাক্কা তাৎক্ষণিকভাবে সামাল দেওয়া হয়।

> ২০১৭ সালের প্রথম মাসের শেষ লগ্নে এসে 'ইকোনমিক সার্জিক্যাল অপারেশন'-এর পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে চা-বাগিচাগুলিতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অপ্রতুল। সমস্যা বাড়ছে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে। চা-বলয়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বাগান মালিকদের বৃহত্তম সংগঠন ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিআইটিএ)-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্ট।

কিন্তু ২০১৭ সালের প্রথম মাসের শেষ লগ্নে এসে 'ইকোনমিক সার্জিক্যাল অপারেশন'-এর পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে চা-বাগিচাগুলিতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অপ্রতুল। সমস্যা বাড়ছে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে। চা-বলয়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বাগান মালিকদের বৃহত্তম সংগঠন ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (ডিবিআইটিএ)-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্ট। রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী সংগঠনের সদস্যভুক্ত ৫৫টি চা-বাগিচায় ১,১২,৯৮২ জন শ্রমিক আছে। তাদের মধ্যে ৭৫,৯৬২ জন শ্রমিকের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত করে ওঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। জলপাইগুড়ি জেলার বড় ৯০টি চা-বাগিচার মধ্যে ৫৫টি বাগান

পাঠকের কলম

চা-বাগানে আধুনিকতার ছোঁয়া

বছরকয়েক আগের কথা। তখন চারদিকে সোয়াইন ফ্লু নিয়ে চর্চা চলছে। বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন সেই রোগে। দৈনিক পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সেসব নিয়ে বিশদ আলাপ- আলোচনা চলছে। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত হলেও চা-বাগানগুলিতেও সে বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। আধুনিকতার আশীর্বাদ।

চারদিকে মনোরম সবুজের মাঝখানে অলস দ্বীপের মতো বাসস্থানগুলি মাথা তুলে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ আস্বাদ করে। রাতে হাতিরা দল বেঁধে এসে হানা দেয়। আর দিনের বেলায় চলে দু'টি পাতা একটি কুঁড়িকে গাছ থেকে ছিঁড়ে ব্যাগবন্দি করার প্রতিযোগিতা। প্রকৃতির কাছাকাছি পাশাপাশি এক মূল্যবান যাপনচিত্র। কত রকমের পোকামাকড় আর পাখপাখালি যে দেখা যায়, তার ইয়ত্তা নেই। চা-জনজাতির জীবনস্রোতে এরই পাশাপাশি চলছে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ।

সব চা-বাগানের শ্রমিকরাই বেশির ভাগ আদিবাসী। তাঁদের পূর্বজরা বিহার, মধ্যপ্রবেশ, বর্তমানের তেলেঙ্গানা, ওড়িশা বা অন্য কোনও রাজ্য থেকে একসময় এসেছিলেন চা-বাগানে। কালক্রমে সেখানেই স্থিতু এবং আজ বাগানে হাজার কর্মকাণ্ডের সক্ষম মেরুদণ্ড। গাছ থেকে কাপ অবধি চা-যাত্রা সুষ্ঠু করতে হাত লাগান তাঁরা। সেই চা যিনি পান করবেন, তাঁর মনেও সতেজ সবুজ হাওয়া খেলে যায়।

সব বাগানেই শ্রমিকজীবনের চালচিত্র মোটামুটি এক। খাওয়াদাওয়া মোটের উপর সাধারণ ডাল-ভাত-সবজি। কখনও মাছ বা ডিম অথবা মাংস। অনেকে শুয়োরের মাংস খেতেও পছন্দ করেন। বাড়িতেও কেউ কেউ শুয়োর পোষেন। সেসব বিক্রিও হয়, খাওয়াদাওয়াও হয়। অ্যালেক্সিউস নামের এক আদিবাসী খ্রিস্টান যুবককে চিনতাম। অ্যালেক্সিউস খালকো। পাতা তোলে। বয়স আন্দাজ তিরিশ। ঘোর শ্যামবর্ণ সুদর্শন স্ফূর্তিবাজ চৌকশ ছেলে। একজোড়া সুন্দর ঝকমকে কালো চোখ। মিষ্টি কথাবার্তা। এক কথায় সপ্রতিভ। চারদিকে সোয়াইন ফ্লু-র সতর্কতা জারি। অ্যালেক্সিউসকে ডেকে বললাম, 'ঘরে বা লাইনে শুয়োর পোষে না যেন কেউ, আজকাল শুয়োর থেকে অসুখ হচ্ছে।' স্বভাবজাত লাজুক হেসে সে বলল, 'ওই সোয়াইন ফ্লু তো, তা-ই না ম্যাডাম?' আমি অবাক। তারপর আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে অ্যালেক্সিউস জানাল, 'সেই মেক্সিকো থেকে এই রোগটার ভাইরাস এসেছে এদিকে। টিভির নিউজে আর মোবাইলের নেটে দেখলাম। এখন শুয়োরের মাংস বা ঘরে পোষা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু শোনে না কেউ— এটাই মুশকিল। তাই আমি ওদের বোঝাতে চেষ্টা করি।' অ্যালেক্সিউসের ঝকঝকে চোখ দুটোতে যেন আলোর ঝিলিক দেখলাম। আধুনিকতায় উজ্জ্বল।

ব্রজেন ছিল আরেকটি বাগানে। তার বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর তাঁর স্থায়ী চাকরিটি সে পেয়েছিল। বয়স অল্প। অভিজ্ঞতা আরও কম। কোম্পানি থেকে বাবার পিএফ ইত্যাদির টাকা পেয়ে ধরাকে শরা বানিয়ে ফেলেছিল। মোবাইল ও মোটরসাইকেল কিনে ফেলল দু'মাসের মধ্যে। শুরু হল কাজে ফাঁকি। কাজে এলেও যখন-তখন ফোনে কথা বলতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে থাকে। শেষমেশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা। ফোনে কথা বলতে বলতে চালাচ্ছিল। তার রোগা-ভোগা বিধবা মা আরও একা হল। আধুনিকতার অন্ধকার রূপ দেখলেন সেবার।

বুড়ো বুধরাম স্কুলে যায়নি কখনও। বাগানের কাজে ভুলেও সে ফাঁকি মারে না। একটাই ছেলেকে বড় করার জন্যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভরতি করেছিল। পড়শিদের মাঝেমধ্যেই বলত তার বই-খাতা কেনা, টিউশন পড়ানো, এমনকি সাতসতেরো চিন্তার কথা। বলত ছেলের সম্ভাব্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু সে ছেলে ক্লাস নাইনে উঠেই পাশের বাড়ির সিক্সে পড়া মেয়েকে ধর্ষণ করে। শেষে পাপ চাপা দিতে খুন করে তাকে। থানা-পুলিশ হল। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ছেলেটি জানাল, ভিডিয়োতে সে দেখেছে এসব। ছেলেটি নাবালক, তাই দিনকয়েক বাদে তাকে জুভেনাইল হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর ইংলিশ মিডিয়াম ছেলের বাবা বুধরামের ঘোলাটে দু'চোখ থেকে আধুনিক হওয়ার ভাঙাচোরা স্বপ্ন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল। এই কি আধুনিকতা? কী জানি?

আবার এমনও হয়েছে। এই তো ক'দিন আগের কথা। সে দিন বাজারে গিয়ে দেখি, টাকার ব্যাগটাই ঘরে ফেলে গিয়েছি। এদিকে, পরদিন বাড়িতে দু'-তিনজন অতিথি আসবেন। জিনিসপত্র কিনতে হবে গুনে-গেঁথে। সময় নেই অথচ হাত একেবারে শূন্য। এটিএম কার্ড আর মোবাইলটাও সেই ব্যাগের মধ্যেই। আমার মাথায় হাত। কী করি তা-ই ভাবছি অস্থির হয়ে। মাছ-মাংস-সবজি কিনে ফেলেছি, কিন্তু টাকা দিতে পারছি না। বাড়িতেও ফোন করতে পারছি না যে টাকা পাঠাতে বলব। কী বিপদ। সঙ্গে গিয়েছিল কিষণ। আমায় রান্নার কাজে সাহায্য করে। চটপটে ছেলে। আমার দুর্দশা দেখে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ম্যাডাম, আমি টাকা দেব?

আমি অবাক হয়ে বললাম, অনেক বাজার করে ফেলেছি, তুমি কী করে টাকা দেবে? টাকা এনেছ?

ও বলল, টাকা নেই, তবে এটা আছে। বলে সে পকেট থেকে তার এটিএম কার্ডখানা বার করে ফেলল। বলল, ওই যে, রাস্তার ওপারেই এটিএম। ওখান থেকে এখনই নিয়ে আসব। তিন হাজার টাকা হলে এখন হবে তো?

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, হবে মানে? আলবাত হবে। তোমার এটিএম কার্ড আছে?

—আছে ম্যাডাম। আজকাল আমাদের বেতন ব্যাঙ্কেই সরাসরি জমা হয় তো, তাই কার্ড পকেটেই রাখি। কখন কী দরকার হয়।

বলেই ছুটল আমার মুশকিল আসানের ব্যবস্থা করতে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এই না হলে আধুনিক?

কালী পুজোর পর প্রায় সব বাগানে রাতভর গানবাজনার অর্কেস্ট্রা চলে, সঙ্গে উদ্দাম নাচ। ওরা বলে 'অৱ্কেস্টার'। এক মধ্যরাতে এরকমই 'অৱ্কেস্টার' আসরে দুই যুবকের সাধারণ কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়, এবং শেষে একজন আরেকজনের পেটে ধারালো কুকরি দিয়ে আঘাত করে। হাসপাতালে প্রায় দেড় মাস কাটিয়ে ঘরে ফিরেছে সে। মৃত্যুমুখ থেকেই বলা যায়। আসলে বেপথু আধুনিকতা বড় বালাই। সে চা-বাগানের অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেই হোক কিংবা অতি শিক্ষিত বড়লোকের ঘরেই হোক। তাই সময়ে সাবধান হওয়া বড় প্রয়োজন। তবে হ্যাঁ, আধুনিকতার আশীর্বাদকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার মধ্যেও একটা আলাদা তৃপ্তি আছে বইকি।

মধুমিতা ভট্টাচার্য

ডিবিআইটিএ-র সদস্যভুক্ত। ৫৫টি চা-বাগানের মোট চা শ্রমিকের মধ্যে ৩৭,০২০ জনের অ্যাকাউন্ট হয়েছে ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে। বাকিদের অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া চলছে। ৫৫টি চা-বাগিচার মধ্যে ২৩টিতে কোনও ইন্টারনেট পরিষেবা খুবই খারাপ। দেখা যাচ্ছে, চা-বাগিচাগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বেহাল। বাগান থেকে ব্যাঙ্ক এবং এটিএম কাউন্টারের দূরত্ব এতটাই বেশি যে, শ্রমিকদের সেখানে যেতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যেসব শ্রমিকের নিজ নিজ অ্যাকাউন্ট আছে, তাঁদের মজুরির টাকা জমা পড়ার পরেও এটিএম বা ব্যাঙ্কে প্রয়োজনীয় টাকা তোলার সুবিধা মিলছে না। চা-বাগান মালিকদের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অব প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহার মতে, বাগানে বাগানে শিবির করে শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলাতে যদি ব্যাঙ্কগুলি এগিয়ে আসে, তবে তাঁরাও সহযোগিতা করবেন।

শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝেই জলপাইগুড়ির গয়েরকাটা, গুডহোপ, সোনগাছি, আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়া, মাল ব্লকের যোগেশচন্দ্র বাগান, তরাইয়ের মাটিগাড়া, মেরিভিউ, ত্রিহানা, জয়ন্তিকা, অটল, বেলগাছি চা-বাগানে পুরনো পদ্ধতিতেই মালিকরা বাগানগুলিতে নগদে মজুরি দিয়েছেন। তরাইয়ের ২৫টি চা-বাগিচার শ্রমিকদের ১৫দিনের মজুরি দু'দফায় দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন বাগানে পুরো মজুরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েকটি বাগানে দু'হাজার টাকার নোটে মজুরি দেওয়ার জেরে সেই নোট ভাঙাতে গিয়ে শ্রমিকরা বড়ই বিপাকে পড়েন। নোটের গেরোর মধ্যেই নিয়ম মেনে তরাইয়ের বেশির ভাগ চা-বাগানে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার কাজ চলছে। শ্রমিকেরা যাতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলেন, সে জন্য মালিকদের তরফেও প্রচার চালানো হচ্ছে। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক রানিচেরা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ শুরু করে। তবে চা-বাগানে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার ক্যাশলেস বা নগদহীন ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করায় উদ্বিগ্ন ডুয়ার্সের শ্রমিকমহল। এই ব্যবস্থায় সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক মজুরির টাকা নির্দিষ্ট দিনে কীভাবে হাতে পাওয়া যাবে তা নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। যেহেতু ক্যাশলেস ব্যবস্থা আসলে কী, সেটা শ্রমিকরা এই ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময়কালেও জানে না বলে সমীক্ষা রিপোর্টে ধরা পড়েছে। ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা-বাগিচায় শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কর্মসূচিতে শ্রমিকরা সাড়া দিলেও অ্যাকাউন্ট থেকে মজুরির পুরো টাকা সবাই এক করে ঘরে তুলতে পারবে কি না তা নিয়ে শ্রমিকরা চিন্তিত। তাই উদ্বিগ্ন শ্রমিকদের সাফ কথা, মজুরির টাকা আগের মতোই নগদে দেওয়া হোক। বিভিন্ন চা-বাগিচার শ্রমিকরা এই দাবিতেই মুখর। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে সচেতনতা শিবির আয়োজনের আশ্বাস মিলেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। চা-বাগিচার বিভিন্ন ইউনিয়নের মতে, বাগিচাগুলিতে নগদহীন মজুরিব্যবস্থা চালু করা হলে শ্রমিকরা ঠগ বা প্রতারকদের পাল্লায় পড়তে পারে। কারণ, বাগিচার কর্মরত নিরক্ষর শ্রমিকরা টিপসই দিয়ে মজুরি তুলে থাকেন বলে মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তাই মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে তা শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী বলে দাবি ইউনিয়নগুলির। তাদের মতে, ব্যাঙ্ক থেকে মজুরির টাকা তুলতে গেলে শ্রমিকদের কাজ কামাই করে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। তাতে শ্রমিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ক্যাশলেস ব্যবস্থা চালু হলে দুঃখকষ্ট আরও বাড়বে। তাই শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, নগদহীন মজুরিব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে ধারণা তৈরির লক্ষ্যে প্রতিটি চা-বাগানে সচেতনামূলক শিবির করুক প্রশাসন। এতে শ্রমিকদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

নগদ টাকার বদলে শ্রমিকদের চেক কিংবা অনলাইন ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমেই মজুরি কিংবা বেতন মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে চিন্তাভাবনা করছে, তাতে দেশব্যাপী কর্মসংস্থানের হার আরও হ্রাস পাবে বলেই আশঙ্কা করছে ডান ও বাম-শ্রমিক সংঘগুলি। বিষয়টি নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনে নামার ব্যাপারে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন শ্রমিক সংগঠনগুলির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। নোট বিভ্রাটের জেরে এহেন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকরা যে সমস্যায় পড়বেন তা মেনে নিয়েছে গেরুয়া শিবিরের শ্রমিক সংগঠন বঙ্গীয় মজদুর সংঘও। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী বঙ্গার দত্তাত্রেয় বলেছেন, নগদের পরিবর্তে শ্রমিকদের মজুরি চেক কিংবা অনলাইন ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে মিটিয়ে দেবার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পেমেন্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার কথা ভাবা হচ্ছে। ফলে প্রাপ্য মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আর বঞ্চনার শিকার হতে হবে না। শ্রমিক সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মতে, নোট বাতিলের জেরে সৃষ্ট ডামাডোলের বাজারে শ্রমিকদের যাবতীয় মজুরি নগদে না দেওয়ার চিন্তাভাবনা তাঁদের মাহিনা না দেবারই সমান। কারণ, শ্রমিকরা কাজ করবেন, নাকি ব্যাঙ্কে লাইন দেবেন? লাইন দিলেও কাউন্টারে গিয়ে শুনবেন ব্যাঙ্কে পর্যাপ্ত টাকা নেই। তাই এহেন পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত নয়। তা ছাড়া পেমেন্ট

অব ওয়েজেস অ্যাক্ট-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সংসদের মাধ্যমে পাশ করাতে হবে। অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের মতে, গ্রামাঞ্চলের ৪০ শতাংশ এলাকায় এখনও অধিকাংশ মানুষের কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই নেই। তাই চেকে বা অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে মজুরি মেটালে তাঁরা তা তুলবেন কেমন করে? তাই গ্রামীণ ভারতের ক্ষেত্রে এটি সুষ্ঠু কোনও ব্যবস্থা নয় বলেই দাবি ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের দুর্দশার ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর উর্জিত পটেলের কাছে জোর সওয়াল করেন। মমতার অভিযোগ ছিল, অসমের চা-বাগিচা শ্রমিকদের জন্য আলাদা টাকা দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গের চা-শ্রমিকরা পক্ষপাতিত্বের কারণে বঞ্চিত রয়েছেন। মমতার অভিযোগের সারবত্তা আছে বুঝতে পেরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর উর্জিত পটেল পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা রেখা ওয়ারিয়রকে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দেন, এবং সেই নির্দেশ মোতাবেক নবান্নর ১৩ তলার কনফারেন্স রুমে বৈঠক ডাকা হয়। মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রসচিব মলয় দে, অর্থসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, টি অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম শীর্ষ কর্তাব্যক্তি, স্টেট ব্যাঙ্কের কলকাতা সার্কলের জেনারেল ম্যানেজার পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত এবং স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কারস কমিটির কর্তারাও হাজির ছিলেন। ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলেন রেখা ওয়ারিয়র। জেলাশাসকরা ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমেই জানান, চা-বাগানের শ্রমিকরা টাকা পাচ্ছেন না। এটিএমে চাহিদামতো টাকা নেই। সব এটিএম কাজ করছে না। ব্যাঙ্কেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। সমস্যার সমাধানে তাঁরা কী করছেন, তারও ব্যাখ্যা করেন। মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-সহ ব্যাঙ্ক কর্তাদের বলেন, যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, তাদের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে, এবং যাদের টাকা নেই, তাদের নগদে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাসুদেববাবু আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাঙ্কিং এজেন্টরা চা-বাগানে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে। বৈঠকে ঠিক হয়, প্রতিটি চা-বাগানে ব্যাঙ্কগুলি বিজনেস করেসপন্ডেন্স নিয়োগ করবে। তাঁরাই প্রতিটি বাগানে গিয়ে চা শ্রমিকদের নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবেন। অনেক জায়গায় কানেক্টিভিটির সমস্যা রয়েছে বলে ব্যাঙ্ক কর্তারা জানিয়েছেন। সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভি-স্যাট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তাদের মতে, উত্তরবঙ্গে ১৬টি কারেন্সি চেস্ট আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা দিলেই সেই টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের প্রায় ৩০০ চা-বাগিচার প্রায় ৭০,০০০ শ্রমিক নোট বাতিলের পর থেকে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে তাঁদের হাটে টাকা তুলে দিতে উদ্যোগী হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

মজুরি প্রদান সংক্রান্ত প্রশ্নে মাঝেমধ্যেই উত্তাল হয়ে উঠছে ডুয়ার্স বা তরাইয়ের বাগিচা ক্ষেত্রগুলি। মোগলকাটা চা-বাগিচার ম্যানেজার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানান, স্টাফ, সাব-স্টাফ এবং শ্রমিক মিলে মোগলকাটা চা-বাগানে মোট ১,০৪০ জন শ্রমিক রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯০০ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তাঁদের সকলের অ্যাকাউন্টেই মজুরির টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র যাঁদের অ্যাকাউন্ট নেই, নগদের অভাবে তাঁদের মজুরি মেটানো সম্ভব হয়নি। অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অসুবিধার বিষয়গুলি খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান মৃগাঙ্কবাবু। আসলে মোগলকাটা বাগানের শ্রমিকদের পাক্ষিক বেতন পাওয়ার কথা ছিল। সেইমতো শ্রমিকদের সদ্য খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মজুরির টাকা জমা করে দেন মালিকপক্ষ। কিন্তু শ্রমিকদের সকলে সেই টাকা হাতে পাননি বলে অভিযোগ বাগান শ্রমিকদের। রাজকিরণ ওঁরাও, লছমন ওঁরাও, সুখমইত ওঁরাও, দীপা ছেত্রী, ফুলো খাড়িয়া, মহাদেব ওঁরাওরা ব্যাঙ্ক, এটিএমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে টাকা তোলার কথা ভাবতেই পারেন না। তাই সমস্যা অত্যন্ত জটিল।

চা-বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি মেটাতে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মুক্তা আর্যর দপ্তর থেকে একটি সরকারি অ্যাকাউন্ট বাগান কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ টাকা জমাবার জন্য। সেখান থেকে বাগানগুলিকে টাকা তোলার অনুমতি প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও চা-বাগিচা সংলগ্ন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন প্রদত্ত সরকারি অ্যাকাউন্টে বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বাবদ টাকা জমা করবে। তারপর সেই টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে শ্রমিকদের মেটানো হবে। কিন্তু অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া সত্ত্বেও বেতন সংক্রান্ত সমস্যার পুরোপুরি সুরাহা হল না। কারণ, সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে বাগানগুলি একলপ্তে কতটা পরিমাণ টাকা তুলতে পারবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেয়নি।

গত নভেম্বরে নোট বাতিলের পর থেকে চা শ্রমিকদের পাক্ষিক বেতন বা মজুরি বকেয়া থাকলেও টাকার সমস্যার জন্য ব্যাঙ্কগুলি এখনও পর্যন্ত সময়মতো মজুরির টাকা দিতে পারছে না। ৫৫টি চা-বাগানের মধ্যে ১৮টি চা-বাগানের শ্রমিকরা দু'টি পাক্ষিক মজুরি পাননি। অবশিষ্ট বাগানগুলির মধ্যে কিছু বাগানের শ্রমিকরা পাক্ষিক মজুরি পেয়েছেন। কিছু চা-বাগান আছে, যারা আংশিক মজুরি পেয়েছে। মাল ব্লকের যোগেশচন্দ্র চা-বাগান থেকে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা ও এটিএমের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিমি। নাগরাকাটার ভুটান সীমান্তবর্তী জিতি চা-বাগান থেকে ব্যাঙ্ক ও এটিএমের দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। এটিএম থাকলেও তার পরিষেবা কখনও পাওয়া যায় না।

ডিবিআইটিএ থেকে জানা গেল, ধূপগুড়ি ব্লকের বানারহাট এলাকার গ্যান্দ্রাপাড়া চা-বাগানের স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির টাকা বাগান তার অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি করার পরেও শ্রমিকরা এটিএম বা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে সমস্যায় পড়ছেন স্রেফ অজ্ঞতার কারণে। নাগরাকাটার হোপ চা-বাগানের শ্রমিকরা ৭ কিমি দূরে টাকা তুলতে গিয়ে নগদ না পেয়ে ফিরে আসছেন। মেটেলির চালসা চা-বাগিচার শ্রমিকরা মজুরি নিজ অ্যাকাউন্টে পেলেও ১১ কিমি দূরে এটিএম বা ৪ কিমি দূরত্বে মেটেলিতে ব্যাঙ্কে গিয়েও নগদ টাকার জোগানের জন্য হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। কুর্তি, নাগরাকাটা, হিলা, নয়াসাইলি চা-বাগানের শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় টাকা দিতে পারেনি টাকা না থাকার জন্য। ফলে যাঁদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তাঁদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। মাল ব্লকের রাঙামাটি এবং মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি চা-বাগানের অস্থায়ী শ্রমিকরা চা-বাগিচায় শুখা মরশুম হবার কারণে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছেন। তাই শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করা যায়নি। মাল ব্লকের ওয়াশাবাড়ি চা-বাগানের বহু শ্রমিক আধার কার্ড না থাকার জন্য অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছেন না। মেটেলির দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ইঙ্গো বাগান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ফর্মুলা মোতাবেক যে পরিমাণ টাকা পাওয়ার কথা ছিল, মজুরি প্রদান বাবদ তার থেকে কম টাকা পেয়েছে। এতে সকলকে মজুরি দিতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষকে। তাই বাগানের শ্রমিকদের নাগালের মধ্যে ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো না থাকলে চা-বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে না।

কলেজে কলেজে গোষ্ঠী সংঘর্ষ মহাভারতের মতো ভ্রাতৃনিধন যজ্ঞে ধ্বংসের ইঙ্গিত করে!

যদুবংশের কুলপতি শ্রীকৃষ্ণর কূটনীতি ও বীরত্বের আশ্রয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তো বটেই, পাণ্ডবরা একের পর এক বিপদকে জয় করে সর্বত্রই বিজয়ী হয়েছিলেন। সেই যদুকুলপতি কৃষ্ণর উপস্থিতিতেই বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল কোনও বহিঃশক্তির আক্রমণে নয়, ধ্বংস হয়েছিল একে অপরকে হত্যা করার আত্মঘাতী নিধনযজ্ঞে শামিল হয়ে। একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বিজয়ী পাণ্ডব রাজসভায়। যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেকের পর ব্রাহ্মণদের দু'হাত ভরে দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা যুধিষ্ঠিরের গুণকীর্তনে মুখরিত হলে, দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মলিন পোশাকে কিন্তু দৃপ্ত ভঙ্গির প্রজ্বলিত শিখার মতন এক ব্রাহ্মণ। যুধিষ্ঠির তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে বিপ্র, আপনি কেন দূরে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনিও এই বিপ্রদের মতন আমার দান গ্রহণ করুন।' সেই ব্রাহ্মণ উত্তরে জানালেন, 'আমি তো এদের মতন স্তুতিগান গাইতে পারব না। এরা আপনার গুণগান গাইছে, কারণ আপনি এদের নানা মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিচ্ছেন। তাই এই যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব এরা সম্পূর্ণভাবে আপনার মুকুটে উজাড় করে দিচ্ছে। একই স্তুতিগানই এরা গাইত দুর্যোধন এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে এভাবে এদের জন্য দানের ডালি খুলে দিলে। আমি যে আপনার প্রতি বিজয়ধ্বনির মধ্যে হাজার হাজার সেনার মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তনাদ ও এই যুদ্ধে স্বজনহারাদের ক্রন্দনের ভারী বাতাস শুনতে পাচ্ছি ও অনুভব করছি। আপনার এই বিজয়ের পিছনে আমাদের মতো দান গ্রহণকারীদের কোনও অবদান নেই। আপনাকে এই বিজয় সিংহাসনে বসাবার জন্য যে সমস্ত সেনানী তাদের প্রিয়জনদের বিরহসাগরে নিক্ষেপ করে জীবনদান করেছে, তাদের প্রিয়জনদের জন্য আপনার কোষাগার থেকে সম্পদ বিলি না করে আপনি অপাত্রে খরচ করছেন।'

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কর্ণে কথাগুলি নিশ্চয়ই শ্রুতিমধুর হয়নি। তবে এই স্পষ্টভাষী ব্রাহ্মণের প্রতি তিনি কী ব্যবহার করেছিলেন তা এই মহাকাব্যের ভাষ্যকারের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি।

এই রাজ্যে বিপুল সংখ্যক বিধানসভার আসনে বিজয়ী হয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। চারপাশে এখন শুধু স্তাবকের ভিড়। এরাই কিন্তু ভিড় জমাত সিপিএম-এর রাজত্বকালে সিপিএম নেতার বাড়ি ও দলের দপ্তরে। তখন তো ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে একটাই স্লোগান— সামনে কে? সিপিএম। বামে কে? সিপিএম। যাচ্ছে কে? সিপিএম। সেই স্লোগানের নেতা যদি কেউ হেঁকে বসত, মারবে কে? উত্তরটা একই জোয়ারে ভেসে আসত— সিপিএম। হয়ত বা কেউ সেই স্লোগান দিয়েছে, তবে অনুচ্চ স্বরে। সরকারের সুরে সুর না মেলালেই সে প্রতিক্রিয়াশীল।

সে দিন কলেজগুলিতে এসএফআই ছাড়া আর কোনও সংগঠনের অস্তিত্বকে মেনে নিতে রাজি ছিল না শাসকদলের ছাত্র সংগঠন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যদি সিপিএম-এর পছন্দের লোক না হতেন, তাঁর জন্য কী ধরনের লাঞ্ছনা অপেক্ষা করত, তার কদর্যতম উদাহরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্যর উপর শাসকদলের ক্রমাগত দুর্ব্যবহার, এমনকি শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা। আজ সেই কলেজগুলিতে রাজনৈতিক আকাশের মেঘের রং পালটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সিপিএম শাসকের স্তাবকতার ভৈরব সংগঠনের অস্তিত্ব ভোজবাজির মতন বিলুপ্ত। সেখানে আজ সেই একই স্লোগান নিয়ে উপস্থিত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। পার্থক্য শুধু সে দিনের স্লোগানের এসএফআই-এর পরিবর্তে এখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

কেন কলেজে কলেজে এত সংঘর্ষ?

আজ তো কলেজে বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব নেই। তবে কেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নিজেদের মধ্যেই এমন সংঘর্ষ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আহত ছাত্রীকে তৃণমূল সদস্যদের বয়ে নিয়ে যাবার এমন চিত্র সংবাদপত্রে কেন দেখতে হয়? বলতে তো পারছে না, বিরোধী কোনও ছাত্র সংগঠনের সদস্যের হাতে সে নিগৃহীতা হয়েছে।

এইভাবে কলেজে কলেজে আত্মনিধন গোষ্ঠীকোন্দল দেখে মনে পড়ে যায় কৃষ্ণর প্রতি গান্ধারীর অভিশাপের কথা। বিধবা পুত্রবধূদের করুণ আর্তনাদ ও মহাশ্মশানে পুত্র-পৌত্রাদির মৃতদেহ দেখে সেই গান্ধারী, যিনি ধর্মের প্রতি অবিচল থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে পুত্র দুর্যোধন আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এলে তাঁকে জয়ী হবার আশীর্বাদ করতে পারেননি, সেই গান্ধারী এই কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণকেই দায়ী করে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'হে কেশব, তুমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কুরুকুলকে এই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারোনি। হে কেশব, পাতিব্রত্যের ফলে আমি যে পুণ্য অর্জন করেছি, তার বলে তোমাকে আমি অভিসম্পাত করছি— আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে তোমার জ্ঞাতিগণও পরস্পর এভাবে হানাহানি করে নির্মূল হবে। আর তুমিও জ্ঞাতি-বান্ধব ও পুত্রদের হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে এবং শোচনীয়ভাবে নিহত হবে। কুরুবংশের স্বজনহারা বিধবাদের মতো তোমার বংশের বিধবাদেরও করুণ আর্তনাদে আকাশ ভেঙে পড়বে।'

কলেজে কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দলে একের বিরুদ্ধে অপরের আক্রমণ, ট্রেড ইউনিয়নে একই ঝান্ডার হাতল নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করা, এমনকি খুন— সবকিছু দেখে একটাই আশঙ্কা উঁকি দেয়, এর পরিণতি কি শেষ পর্যন্ত সেই কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃঘাতী নিধনযজ্ঞের পরিণতি নেবে?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পিছনে তো ছিল

সাম্রাজ্যের আসন দখলের লড়াই। এখানে তো সাম্রাজ্যের আসন শুধু তৃণমূলের দখলেই নয়, সর্বত্র তাদের একচ্ছত্র অধিকার। বামফ্রন্ট তার রাজত্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল করতে যে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছিল, আজ সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে। সেই একই পথের পথিক হয়ে তৃণমূলের সদস্যরাও আত্মনিধনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু কেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পিছনে না হয় শ্রীকৃষ্ণর মতন একজন চালিকাশক্তির খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু তৃণমূলের এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পিছনে যে অসংখ্য শ্রীকৃষ্ণর হাত আছে। স্বজনহারাদের মায়েরা কাকে অভিশাপ দেবে? সে দিন এক মায়ের অভিশাপে যদি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার ও তাঁর কুলের বিনাশ ঘটতে পারে, তবে এই হাজার হাজার মায়ের অভিশাপে কী ভয়ংকর ফল হতে পারে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন থাকলেও, তা ক্ষমতার দর্পে ভাবা হয় না

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন মানুষ গড়ার কারিগরের প্রয়োজন হয় না। সেখানে তাই শিক্ষাগত মানের পরিবর্তে দলীয়, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে গোষ্ঠী আনুগত্যকেই স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠি ধরা হয়।

বলেই কিন্তু একের পর এক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন এই দখলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তা নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যতের উপর রাজনৈতিক দলগুলি তাদের স্ব স্ব গোষ্ঠীগত লড়াইতে কে কতখানি স্বার্থসিদ্ধি করতে পারল, সেটা তাদের বিষয়। তবে তাদের স্বার্থে সাধারণ মানুষ, সে যে দলেরই সমর্থক হোক না কেন, কেউ তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে বলি দিতে রাজি হতে পারে না।

জলপাইগুড়ি বা কোচবিহার যে জেলাই হোক না কেন, আনন্দ চন্দ্র কলেজ বা আচার্য ক্ষেত্রমোহন শীল কলেজ— যে কলেজই হোক না কেন, যে সমস্ত অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের পড়তে পাঠান, তাঁরা নিশ্চয়ই তাদের কোনও রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী নেতাদের গদি দখলের লড়াইয়ে শহিদ হতে পাঠান না। শহিদ শুধু মৃত্যুবরণ করলেই হয় না। আত্মজকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে আত্মহত্যার মঞ্চে শহিদে রূপান্তরিত করতে কোনও জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী চাইতে পারেন না। পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক চাপে তাঁদের আপত নীরবতাকে দলের প্রতি সমর্থনের চিহ্ন বলে বুদ্ধদেববাবুরা যে ভুল করেছিলেন, একই ভুলের মাশুল যে অদূর ভবিষ্যতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দেরও দিতে হবে, সেই দেওয়াল লিখন না পড়তে পারলেই পতন অনিবার্য।

সভ্যতার মহত্তম বৃত্তি শিক্ষকতা। সেই বৃত্তিই এখন রাজনৈতিক দলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য, নয়ত উৎকোচের পিচ্ছিল পথ ধরে সেই ভাবনার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সহজতম অর্থোপার্জনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। এরা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের মুখে হাসি ফোটাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার পীঠস্থানের পরিবর্তে রাজনৈতিক শিষ্যাধারে শিক্ষার্থীদের জমা করে দলানুগত্যের জন্য নির্মাণ করতে চায়। একসময় এদের অধিকাংশই ছিল সিপিএম শাসকদলের শিক্ষা শিবিরের দাসানুদাস। আজ রাতারাতি তারাই রূপান্তরিত হয়েছে তৃণমূল শাসকদলের শিক্ষক সংগঠনে তৃণমূলিদের থেকেও বড় তৃণমূলি প্রমাণে এক গোষ্ঠী নেতার অনুগতের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিযোগী রূপে। ছাত্ররাই সহজতম শিকার। দামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যেমন আইআইটি, আইআইইএম-তে কিন্তু এমন ইউনিয়নবাজি নেই। সেখানে রাজনৈতিক নেতাদের দলবাজির দৌরাত্ম্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সেখানকার ছাত্রদের রাজনৈতিক জালে ধরা মুশকিল। কারণ এদের ভবিষ্যৎ বলা যেতে পারে নিশ্চিত। একসময় মেধাবী ছাত্ররাই কিন্তু ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বে আসত। এর কারণ ছিল মূলত দু'টি। প্রথম ছিল এক দৃঢ় রাজনৈতিক আদর্শবোধ। ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের হাতিয়ার নয়, দেশ ও দেশের জন্য কিছু করার আদর্শবোধের তাড়নাতে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা যোগ দিত রাজনীতিতে। অপর একটা গৌণ কারণও ছিল। এরা আসত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটামুটি সম্পন্ন পরিবার থেকে। তাই ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক পিছুটান ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

এখন সাধারণ কলেজের ছাত্ররা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ। গতানুগতিক পরীক্ষায় যে কোনওভাবেই হোক, তারা একটা সার্টিফিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা থেকে পেয়ে যায়। কিন্তু চাকরির বাজারে 'নো ভ্যাকেন্সি'র প্রাচীর ঠেলে ভিতরে ঢোকার ছাড়পত্র রূপে এটি একটি নিছক কাগজ বলে গণ্য হয়। তাই তাদের ধরতে হয় 'ক্যাচ'। শিখতে হয়, বুঝতে হয়, কোন নেতার প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা দিলে ভবিষ্যতে কেমন সুরাহা হবে। নেতারা সেই পাইয়ে দেবার টোপ দিয়ে যাঁর যাঁর গোষ্ঠীর শক্তি হাজির করতে চান। ব্যাপারটা অনেকটা সেই মোগল রাজত্বে মনসবদারি প্রথার মতন। সম্রাটের যুদ্ধের প্রয়োজনে যে মনসবদার যত সৈন্য হাজির করতে পারে, রাজদরবারে তার প্রতিপত্তি ও সম্মান ততখানি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন মানুষ গড়ার কারিগরের প্রয়োজন হয় না। সেখানে তাই শিক্ষাগত মানের পরিবর্তে দলীয়, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে গোষ্ঠী আনুগত্যকেই স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠি ধরা হয়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাই ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার আজ ইতিহাসের পাতায় জায়গা নিয়েছে। তাই বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী এমনভাবে ঘোষণা করতে পারেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে— 'আমি অর্থ দিই, তাই সেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমার আছে।'

মনে পড়ে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় সে সময়কার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন সেনকে রাইটারস' বিল্ডিংসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উপাচার্য নিজে না গিয়ে তাঁর সচিবকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠালে মুখ্যমন্ত্রী উপাচার্য নিজে না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। উপাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছেন— এই খবর তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কে কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, তিনি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজে গিয়ে উপাচার্যকে ডেকে পাঠানোয় ভুল হয়েছিল বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডেকে পাঠানো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ভঙ্গ। সিদ্ধার্থশংকর রায় সেই নির্দেশ পালন করে তাঁর প্রশাসনেরই সম্মান রক্ষা করেছিলেন। আজকের ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই গোষ্ঠীসংঘর্ষ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এড়ানো যাবে না। কারণ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সবার স্বার্থই জড়িয়ে আছে। তবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই গোষ্ঠীসংঘর্ষ কিন্তু তৃণমূলের কাছেই এক গভীর অশনিসংকেত। তারা নিজেদের রক্ষা করবে, না আত্মঘাতী এই লড়াইতে যদুবংশের মতন নিজেরাই আত্মহত্যার ফাঁদে পা দেবে, সেই সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে।

সৌমেন নাগ

গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়ন জোরকদমে চলছে মাথাভাঙা-১ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায়

উপরে নতুন তৈরি হওয়া গ্রাভেল রোড। মাঝে চেনাকাটায় মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে BADP ফান্ডে। নিচে সভাপতি আবু তালেব আজাদ

কোচবিহার শহরের পশ্চিমে রয়েছে মাথাভাঙা মহকুমা। শীতলকুচি, মাথাভাঙা ১ এবং মাথাভাঙা ২— এই তিনটি ব্লক নিয়ে গঠিত কোচবিহারের মাথাভাঙা মহকুমার একমাত্র মাথাভাঙা ১ পঞ্চায়েত সমিতিটি বাংলাদেশ লাগোয়া। মাথাভাঙা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতিতে রয়েছে ১০টি পঞ্চায়েত। শিকারপুরে বিরাট চত্বর জুড়ে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মূলত তারা জোর দিয়েছেন রুরাল কমিউনিকেশনের উপর বলে জানালেন মাথাভাঙা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আবু তালেব আজাদ। তার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে কালভার্ট, ব্রিজ, জয়েজ ব্রিজের কাজ তারা করছে। শুধু স্টেট হাইওয়েকে সংযোগ করার রাস্তাই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর মধ্যেও যাতে যোগাযোগ আরও উন্নত হয়, কাছাকাছি স্কুল কলেজে যাওয়ার রাস্তা যাতে আরও ভাল হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর ২০১৩ সালেই পচাগড় আর কুর্শামারী জিপির মধ্যে কচুয়া নদীর উপর সংযোগকারী প্রায় ১০২ ফুট লম্বা কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এরই মধ্যে গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েতে শিউলি নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। বোল্ডারের কাজ সামান্য বাকী রয়েছে, এর মধ্যেই ব্রিজটি উদ্‌বোধন করা হবে। আর একটি কাজ সবে শুরু হয়েছে কেদারহাট জিপিতে কানাডোবা নদীর উপরে।

এছাড়াও গত বছর ১০ টা গ্র্যাভেল রোড তৈরি করা হয়েছে NREGS এর মাধ্যমে, জানালেন সভাপতি। বললেন, BADP-র মাধ্যমে প্রত্যেক বছরই একটা বড় ফান্ড আসে। তাই দিয়ে রাস্তা, অঙ্গনওয়ারি সেন্টার ইত্যাদি নানা কাজ করা হয়। এই টাকা দিয়ে আমরা ৪টি বড় রাস্তা করেছি। ৪/৫ কিমি রাস্তার মধ্যে প্রতি বছর ১ কিমি করে রাস্তা তৈরি করা হয়। একটা হয়ে গিয়েছে, দুটোর কাজ এ বছরই শেষ হবে, আর একটা সামনের বছর শেষ হবে বলে আশা করছি। দু' বছর হল এরা রাস্তার জন্য টাকা দিচ্ছে না। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য টাকা দিচ্ছে। এ বছর আমরা BADP থেকে ৭টি অঙ্গনওয়ারি সেন্টার পেয়েছি বলে জানালেন তিনি। এই পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৪২টি অঙ্গনওয়ারি সেন্টার রয়েছে। জানা গেল তার মধ্যে ১০০টিরও বেশি জায়গায় ঘর নেই।

মাথাভাঙা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস

NREGS এর মাধ্যমে ৫৪টা ঘর করতে বলা হয়েছে। জমি ঠিক মতো পাওয়া গেলে তার মধ্যে ৪৪টি হয়ে যাবে এবছরই।

সভাপতি জানান, এই পঞ্চায়েত সমিতির ৪টি জিপি বর্ডার সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে কুর্শামারী, শিকারপুর, বৈরাগীরহাট ও গোপালপুরে কিছু ছিটে মানুষ এখনও রয়ে গিয়েছে। তারা যায়নি। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে এনক্লেভ ডেভলপমেন্ট থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাই দিয়ে ৪টি ক্লাসরুম, ৪টি টয়েলেট স্কুল তৈরি করা হয়েছে।

কুর্শামারীতে হেলথ সেন্টারের জন্য তারা টাকা পেয়েছে বলে জানালেন আবু তালেব বাবু। মাথাভাঙা এস ডি হাসপাতালের পাশে রয়েছে BPHC। কিন্তু ব্লকে কোনও BPHC না থাকার কথা হলদিবাড়ি প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি নিজে জানান। সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন হেলথ সেন্টারের জন্য। জেলাপরিষদের মাধ্যমে গোপালপুর জিপিতে এই নতুন হেলথ সেন্টার তৈরি হচ্ছে। কাজ শেষ হলে মাথাভাঙার BPHC এখানে চলে আসবে বলে জানালেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

উন্নয়নের মহোৎসবে সামিল মাথাভাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতি

উপরে নতুন তৈরি হওয়া ব্রিজ। ডান দিকে উপরে কুশিয়াবাড়ি থেকে লাফাবাড়ি পিকনিক স্পট যাওয়ার নতুন রাস্তা, নিচে পিকনিক স্পট।

মাথাভাঙা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রথমবার অনাস্থার মধ্য দিয়ে সভাপতি হলেও পরবর্তীতে ২০১৩ সালে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পান উমাকান্ত বর্মন। রাজ্য সরকারের উন্নয়নের মহোৎসবে তিনিও সামিল বলে জানালেন উমাকান্তবাবু। বললেন, আমাদের এখানে রাস্তাঘাট, বিশেষ করে গ্রামের রাস্তা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। সদ্য ২০১৬ সালে কুশিয়াবাড়ি থেকে লাফাবাড়ি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। এই লাফাবাড়িতে একটি নতুন বনাঞ্চল তৈরি করে এখানে পিকনিক স্পটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার কাজ লতাপাতা গ্রামপঞ্চায়েতে এখনও চলছে। এছাড়াও মাথাভাঙা ২-তে যে কিষাণমান্ডি রয়েছে সেখান থেকে শুরু করে পিডব্লুডি-র রাস্তা পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তায়। গত বছরে দুটো বড় কাজ হয়েছে, আরও বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠান রয়েছে সেগুলো অনুমোদনের অপেক্ষায়। তবে আগের তুলনায় গ্রামের রাস্তার উন্নতি হলেও কিছু রাস্তা এখনও খারাপ রয়েছে। গ্রামের ভেতরের কাঁচা রাস্তায় মাটির কাজ বন্ধ হওয়াতে একটু সমস্যা হচ্ছে ঠিকই তবে ১ কিলোমিটার করে পাকা রাস্তা করা গেলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আর থাকবে না। কারণ আমাদের জেলাশাসক পি উলগানাথন বলেছেন, NREGS-এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য যে ৫/৬টি স্কিম নেওয়া হবে সেগুলোতে সাধারণ মাটির কাজ না করে ১ কিমি করে পাকা রাস্তার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যাতে সেটা একটা পাকাপাকি অ্যাসেট হয়ে যায়।

মাথাভাঙা ২ নং ব্লকে রয়েছে ৯৩টি গ্রাম। ১০টি গ্রামপঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই পঞ্চায়েত সমিতির ফুলবাড়ি, বড়শোলমারী, লতাপাতা, নিশিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকাগুলি নদী ভাঙন প্রবণ এলাকার মধ্যে পরে। সভাপতি উমাকান্ত বর্মন জানান, নদীর পাড় বাঁধানো হলে খেতগুলো ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ বিষয়ে সরকারকে বারবার বলা হয়েছে। এতদিন তেমন কোনও উদ্যোগ না নিলেও আশার কথা এ বছর বড়শোলমারীতে সেচ দপ্তর থেকে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেখানে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর প্রচুর ব্রিজ তৈরি হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে বলে জানালেন উমাকান্তবাবু। এখানে ২ নং গ্রামপঞ্চায়েতের পারাডুবি, বড়শোলমারী, রুইডাঙায় জয়েজ ব্রিজ হয়েছে। লতাপাতা জিপির তোর্ষা নদীর উপর এতদিন কোনও ব্রিজ ছিল না। সেখানে ব্রিজ তৈরি হওয়ায় দুই পাড়ের সংযোগটি ভাল হয়েছে। তবে একটা সমস্যা হচ্ছে, ব্রিজের পরে প্রায় ১ কিমি চর এলাকা। সেখানে বালি থাকায় রাস্তা টেঁকে না। এখন কোনও দপ্তর রাস্তা তৈরির ঝুঁকি নিতেও চাইছে না। কারণ রাস্তা করতে গেলে তার পাড় বাঁধাতে হবে, তা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। তবুও আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব এটি তৈরি করতে।

মাথাভাঙা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস

সভাপতি উমাকান্ত বর্মন

মাথাভাঙা ২ মাইনরিটি ব্লক না হওয়ায় BADP, MSDP, BRGF-এর কোনও টাকা তারা পান না বলে জানালেন সভাপতি। তবু জেলা মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু ছোট স্কিম পাঠানো হয়েছিল, আনন্দের কথা যে তার থেকে একটা অনুমোদন পেয়েছে। নিশিগঞ্জের কাছে একটি গ্রেভিয়ার্ড খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। উমাকান্তবাবু আরও জানান, MSDP-র ফান্ড সহ এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে যে পরিমান মুসলিম কমিউনিটির পপুলেশন দরকার তা আমাদের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ২০১১-র সেনসাস অনুযায়ী হিসেব থাকায় আমরা এটা পাচ্ছি না। তবে এবার পাব বলে আশা রাখছি। এগুলো পেলে আরও কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে বলেও জানালেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নির্মল বাংলা গড়তে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি

কোচবিহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শীতলকুচি। আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে এই শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে। মিশন নির্মল বাংলাকে সার্থক করার জন্য জেলার প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতির মতো শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতিও মানুষকে সচেতন করার নানান ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে। এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণকিশোর রায় সিংহ জানান, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক করেছে যে এখানে সরকার আর কারও পায়খানা তৈরি করে দেবে না। যাদের পায়খানা নেই, তাদের প্রত্যেককে নিজেদের পায়খানা নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে। এই নিয়ে আমরা প্রচুর প্রচার চালিয়েছি। লোকজনের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি। সবচেয়ে আশার কথা হল, মানুষ এগিয়ে এসেছে। তারা নিজেদের পয়সায় বাড়িতে পায়খানা তৈরি করেছে। উন্মুক্ত জায়গায় আর কেউ শৌচকর্ম করছে না। যাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তারাও মানুষের কাছ থেকে ধার করে, নিজেরা পরিশ্রম করে টয়লেট বানাচ্ছে। এই গ্রামের এক সহায় সম্বলহীন বিধবা মহিলার লেবারকে দেবার মতো টাকা নেই, তার জন্য বাড়ির পায়খানার ট্যাঙ্কের গর্ত নিজে খুঁড়েছেন। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য এক দোকানদারের কাছ থেকে জিনিসপত্র ধার করে কাজটা শেষ করতে তাকে সাহায্য করেছেন। শীতলকুচি

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণকিশোর রায় সিংহ (ডান দিকে) ও বিডিও অঞ্জন চৌধুরী

গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩টা সংসদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৭টা নির্মল হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন সেখানকার বিডিও অঞ্জন চৌধুরী। বললেন, বাকি ৬টার মধ্যে ৫টা তে কাজ হচ্ছে, সেটা খুব শীগগিরই শেষ হয়ে যাবে। তবে ৪ নং সংসদ একটু দেরীতে কাজ শুরু করেছে, তারাও তাড়াতাড়ি নির্মল হয়ে যাবে বলে আশা করছি। এই পুরো বিষয়টি নেতৃত্ব দিচ্ছেন পঞ্চায়েত সভাপতি কৃষ্ণ কিশোর রায় সিংহ বলে জানালেন অঞ্জনবাবু।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শীতের সকালে গজলডোবা !

ডুয়ার্সের আদি চা-বাগান গজলডোবা। প্রিয়তম যে স্থানটি আমাকে ভীষণভাবেই আকৃষ্ট করে, তার নাম গজলডোবা। একদিকে তিস্তার বিস্তার, অন্য দিকে বিভিন্ন প্রজাতির পক্ষীকুল। শীতে পরিযায়ী পাখিরা গজলডোবার জলে ডানা মেলে হুটোপুটি করছে— এই মধুর দৃশ্য দেখতে শীতের এক সকালে জলপাইগুড়ি শহরের শান্তিপাড়া থেকে ওদলাবাড়িগামী রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস ধরলাম। বোঁদাগঞ্জ হয়ে সাতসকালেই ওদলাবাড়ি পৌঁছালাম আমার ছেলে শৌনক এবং আমি। পাখি, প্রজাপতি এবং প্রকৃতি শৌনকের ক্যামেরায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রবল ফোটোগ্রাফির শখ বলে ওরই জেদে এবং আকুতিতে জলাশয়ে পক্ষীকুলের নিভৃত অবকাশযাপন প্রত্যক্ষ করতে বেরিয়ে পড়লাম নৌকাযোগে। আসা-যাওয়ার পথে বাঁধের উপর ছবির মতো সুন্দর অতিথিনিবাসটি দেখে খুবই লোভ হচ্ছিল। পরিযায়ী পাখিরা গজলডোবার জলে ডানা মেলে হুটোপুটি করছে। আমাদের দু'জনের ক্যামেরার লেন্সে বন্দি করছি অসাধারণ পক্ষীকুলের নিরলস বিচরণ।

পানকৌড়ি, মাছরাঙা, জলপিপি, সরালি, শামুকখোল, খঞ্জন— কত রকমের বক। পক্ষীপ্রেমীরা গড়গড়িয়ে নামধাম-বংশ-গোত্র বলতে পারলেও আমার জ্ঞানভাণ্ডার যৎকিঞ্চিৎ। ন্যাফ-এর পক্ষীপ্রেমীরা বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের সহযোগিতায় গজলডোবা এবং আশপাশের বনভূমি ও জলাজমি অঞ্চলের পাখিদের নিয়ে অসাধারণ ফোল্ডার তৈরি করেছেন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গে ৬৫০ প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। এর মধ্যে শুধুমাত্র গজলডোবাতেই ১৫১টি প্রজাতির পাখির সন্ধান মিলেছে। ফলে দেশ জুড়ে গজলডোবার গুরুত্ব বাড়ছে। সারা বিশ্বে বিপন্ন প্রায় ১৫টি প্রজাতির পাখির সন্ধানও গজলডোবায় মিলেছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে পাখিগুলির ছবি বিদেশি পক্ষীপ্রেমীদের আকৃষ্ট করেছে। শীতের শুরুতে প্রায় ১৫,০০০ পরিযায়ী পাখি আসে উত্তরের বিভিন্ন জলাশয়, বনভূমি এবং অরণ্যভূমিতে। লাদাখ, চিন, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, ইউরোপ থেকেও নিয়ম করে পরিযায়ী পাখিরা গজলডোবায় আসে। তিস্তার বাঁধ দিয়ে কখনও বা ভেসে বেড়ায়। এর মধ্যে যেমন রয়েছে নর্দার্ন ম্যাপউইং, তেমনি রয়েছে অতর্কিতে একসঙ্গে উড়ে যাওয়া লাল ঠোঁটওয়ালা চখা বা রুডি শালডাক। তিস্তা ব্যারেজ ঘিরে সৃষ্ট বিশাল জলাশয় ও চর এলাকাকে দেশি-বিদেশি পরিযায়ী পাখিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বা কনজার্ভেশন রিজার্ভ করার প্রস্তাব কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য রাজ্যের বন দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে। বন দপ্তরের প্রস্তাব কার্যকর হলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা আরও বেশি করে গজলডোবায় আসবেন।

আসলে নাগরিক কোলাহল বা জনারণ্যের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমার পুত্র শৌনকের সঙ্গে, প্রকৃতিকে সাথি করে সবুজের সন্ধানে প্রকৃতির খোলামেলা প্রাঙ্গণে। ফুলেশ্বরী থেকে বেরিয়ে বাদুড়বাগান, জাবড়াভিটা, ফাড়াবাড়ি ফরেস্ট, জোড়াপানি নদী, ডাবগ্রাম বন দপ্তরের অফিস-ঘরবাড়ি পেরিয়ে আমবাড়ি, বেলাকোবা, মান্তাদারি, গজলডোবা হয়ে ওদলাবাড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে যাওয়া যায়। ঘন ঘন অটো কিংবা বাস এ পথে মেলে না। সৎসঙ্গ মন্দির, কিছু দোকান, বিট অফিস, আমবাড়ি রেল স্টেশন, ধান-পাট-চা-বাগানের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেলাকোবা। ডান দিকে বেলাকোবা বাজার, রেল স্টেশন। বাঁ দিকে বটতলা। ভ্রামরী দেবীর মাহাত্ম্য যা-ই থাকুক, সড়কপথ কিন্তু অত্যন্ত মনোরম। গ্রামবাংলার সজীব প্রাণবন্ত রূপ। পুরনো কংক্রিটের সেতু, করলা নদী, নদীর বুকে নুয়ে পড়া গাছপালা, সড়কপথের রেলিং ধারে কাপড়, গামছা শুকানোর প্রচেষ্টা দেখতে দেখতে, সবুজের বুক চিরে অপরূপ পথ এঁকেবেঁকে ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে গিয়ে শেষ। তারপরেই এক ড্রাইভে চলে আসা যায় গজলডোবা।

তিস্তা ব্যারেজ ঘিরে সৃষ্ট বিশাল জলাশয় ও চর এলাকাকে দেশি-বিদেশি পরিযায়ী পাখিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা বা কনজার্ভেশন রিজার্ভ করার প্রস্তাব কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য রাজ্যের বন দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে।

গৌতম চক্রবর্তী

প্রদর্শনী-পিকনিকে জমজমাট শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব

'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব' জমজমাট। গত ২৩ জানুয়ারি জলপাইগুড়ির আড্ডাঘরে ক্লাব মেম্বার শিল্পীর 'আমি চারুলতা' বুটিকের প্রদর্শনী হয়ে গেল। সেদিন শ্রীমতীদের ভিড়ে আড্ডাঘরে চাঁদের হাট বসেছিল যেন। শিল্পীর সঙ্গে মৌমিতাও এসেছিল তার হাতে বানানো গয়না নিয়ে। শ্রীমতীদের নিজস্ব সৃজনশীলতা নিয়ে বারে বারে আমরা একত্রিত হব। এরপর থাকবে খাবারদাবারের মেলা এবং সমাজসেবার কাজে নিজেদের বিলিয়ে দেওয়া শ্রীমতীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'-এ শিল্পী মুখার্জির প্রদর্শনী

ক্লাব মেম্বারদের ডে আউট, অনাবিল আনন্দের ঢেউ

২৬ জানুয়ারি ছিল স্রেফ একটা ডে আউট। 'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব'-এর সদস্যরা মিলে

জমজমাট পিকনিকের শেষে আদিবাসী নৃত্যের তালে পা মেলালেন সবাই

পাঠকের দাবিতে আবার শুরু হল জনপ্রিয় কলম 'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনীরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে।

তেল বোয়াল

উপকরণ

বোয়াল মাছ ৪/৫ টুকরো; সরষের তেল ১০০ গ্রাম; টক দই ১০০ গ্রাম; কাঁচালংকা বাটা ৪/৫টা; পেঁয়াজ বাটা (১টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ); ধনেপাতা কুচি প্রয়োজনমতো; কালো সরষে, কাঁচালংকা ও লবণ দিয়ে বাটা ১ চা চামচ; পেঁয়াজ কুচি (১টা ছোট পেঁয়াজের); হলুদ ও নুন আন্দাজমতো; কালোজিরে সামান্য।

পদ্ধতি

এই রান্নার পদ্ধতি ভীষণ সহজ। ধনেপাতা বাদে বাকি সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মেখে ১০/১৫ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তারপর কড়াইতে ২ চামচ সরষের তেল দিয়ে একটু কালোজিরে ও কাঁচালংকা ফোড়ন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা মাছগুলি কড়াইতে দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট গ্যাসে কমানো আঁচে বসিয়ে রাখতে হবে। মাছ থেকে যে জল বার হবে, সেই জলেই মাছ সেদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর একটু শুকিয়ে যখন বেশ কিছুটা তেল বার হবে, তখন বুঝতে হবে, মাছ খাবার জন্য তৈরি। কুচানো ধনেপাতা ও কাঁচালংকা দিয়ে, রান্নার উপর দিয়ে ঢেকে রেখে, গ্যাস বন্ধ করে, ৫/১০ মিনিট দমে রেখে গরম ভাতে পরিবেশন করুন। অসাধারণ স্বাদ অনুভব করবেন।

ডুয়ার্সের ডিশ

আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল সেদিন। জলপাইগুড়ি শহর থেকে ২৫/৩০ কিমি দূরে বাতাবাড়িতে 'ডুয়ার্স পাম রিসর্টে' সারাটা দিন ধরে আড্ডা মেরে, গান গেয়ে, নাচ করে নানান বয়সের শ্রীমতীরা একসাথে যেন ফিরে গিয়েছিল সেই ছোটবেলায়। 'মহিলাদের জন্য এমন একটি খোলা আকাশ দরকার ছিল'— এই বলে 'এখন ডুয়ার্স' কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। আগামী মার্চ মাসে ক্লাব সদস্য মীনাক্ষী ঘোষের উদ্যোগে মালবাজারেও 'শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাব'-এর শাখা তৈরি হবার আয়োজন চলছে। ওই এলাকার আগ্রহীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। উদ্বোধনের দিন জলপাইগুড়ির সদস্যরাও উপস্থিত থাকবেন সেদিন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

অরণ্য মিত্র

ক্যাভেন্ডিসের শাগরেদ ছিঁড়ে খেলেও বেঁচে গেল মুনমুন টোপ্পো। তাহলে কি এবার ক্যাভেন্ডিসকে খুঁজে পাবে ডার্ক ক্যালকাটার সুরেশ কুমার? দীননাথ চৌহানের রিসর্টে এসে দাসবাবু পেলেন বুদ্ধ ব্যানার্জির ফোন। এবার উঠে এল তৃতীয় এক পক্ষ। এর নাম 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'। নবেন্দু মল্লিককে ডেকে পাঠিয়ে শক্তিশালী একজন নেতা কী বলতে চাইলেন? সে কি তবে ফাঁদে পড়ে আছে? মেগাসিরিয়ালের আরও একটি জমাট পর্ব।

।।৭৩।।

দীননাথ চৌহানের মালিক নতুন বাংলোর ঘরে টিভি লাগিয়েছেন। রঞ্জিত টিভিটা চালিয়ে দিয়ে দু'পাত্র হুইস্কি বানিয়ে একটা দাসবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটা কথা আপনি ভেবেছেন কি না জানি না। ডুয়ার্সে মেয়ে পাচারের কাজে লেগে থাকা আসল গ্যাংটার সঙ্গে আমাদের কোনও রেগুলার কমিউনিকেশন নেই।'

'ওসব বিজু প্রসাদ সামলাত।' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে জানালেন দাসবাবু, 'কিন্তু ওরা কাজ ঠিকঠাক করে যাচ্ছে।'

'এটাই আমি ভাবছি দাদা!' রঞ্জিত সোজা হয়ে বসল, 'আমাদের পর্ন বিজনেস নষ্ট করে দেবে বলে নবীন রাইকে দু'-দু'বার হামলা করল। লেকিন পাচারের লোকগুলোকে অ্যাটাক করল না কেন? আমি শিয়োর, কেউ গেম খেলছে। লেকিন কেন খেলছে?'

দাসবাবু সোফায় হেলান দিয়ে ছাদের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পল অধিকারীকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে ডিল করার যে নির্দেশ বুদ্ধ ব্যানার্জি দিয়েছিলেন, সেটা তাঁর করা হয়ে গিয়েছে। এর পর তাঁর করণীয় কী? ব্যানার্জি আর কোনও নির্দেশ পাঠাননি। বলতে গেলে দাসবাবু এখন দপ্তরহীন মন্ত্রীর মতো সময় কাটাচ্ছেন। ডার্ক ক্যালকাটার মোকাবিলা করার জন্য দিল্লি থেকে যে ডুয়ার্সে এসেছে, তার সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয়নি দাসবাবুর। হতে পারে যে, বুদ্ধ ব্যানার্জি তাকে বিশেষ কোনও কাজের জন্য আলাদা করে ভেবে রেখেছেন— তবুও কোথায় জানি একটা কুয়াশা জমে রয়েছে। এক্ষুনি রঞ্জিত যে বিষয়টা নিয়ে বলল, সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

'এই কয়েক সপ্তাহ ডুয়ার্স ঘুরে আমি যেটা বুঝলাম, সেটা হল, সবাই কমবেশি পাজ্‌লড হয়ে আছে। বিজু প্রসাদের মতো কোঅর্ডিনেট করার জন্য একজনকে চাই। এটা আমি ব্যানার্জিকে জানিয়ে দিয়েছি, লেকিন কোনও স্টেপ নিচ্ছে না। এটা খুব পিকিউলিয়ার লাগছে দাদা! কাজ সব থমকে গিয়েছে আমাদের। ওনলি উওম্যান ট্রাফিকিং চালু আছে।'

গলায় খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বলল রঞ্জিত। এবার দাসবাবু কিছু বলতে চেয়ে নড়েচড়ে বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর ফোন বেজে উঠল। নম্বরটা দেখেই তিনি অনুমান করলেন কলটা বুদ্ধ ব্যানার্জির হতে পারে। তাঁর অনুমান সত্যি হল। ফোনে কেউ বলল, 'বুদ্ধ ব্যানার্জি কথা বলবেন।'

ইশারায় রঞ্জিতকে চুপ থাকতে বলে দাসবাবু বললেন, 'হ্যালো স্যার।'

'চিন থেকে স্যাটেলাইট ফোনের প্রথম লট কয়েক দিনের মধ্যেই কাঠমান্ডু চলে আসবে। সেটা কলকাতায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তোমার। এখন তো তুমি ফ্রি, তা-ই না?' বুদ্ধ ব্যানার্জির শান্ত কণ্ঠস্বর শুনলেন দাসবাবু। উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। আমি কি মিস্টার ক্যাভেন্ডিসকে কোঅপারেট করব?'

'না দাস। তুমি লাল চন্দনের লাইনে ঢুকবে। পল অধিকারীর লোকেরা সে লাইনে আছে। তাদের হেল্প নেবে।'

দাসবাবু অবাক হলেন। দিল্লি হাই যে ডুয়ার্সে লাল চন্দন পাচারের কাজে থাকবে না, সেটা দলের সবারই জানা। তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু স্যার, দিল্লি থেকে তো—।'

'দিল্লি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না দাস।' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। 'ক্যাভেন্ডিস আছে। সে দিল্লির খাস লোক। কিন্তু আমি তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাই। আই লাইক ইউ দাস। আজ থেকে তুমি আমার লোক। দিল্লির নও। ডার্ক ক্যালকাটার সঙ্গে দিল্লি হাই মারামারি করুক দাস। তুমি-আমি এর বাইরে থাকি।'

বুদ্ধ ব্যানার্জির কথার কোনও থই না পেয়ে দাসবাবু বাক্যহারা হয়ে গেলেন। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা বুদ্ধ ব্যানার্জি সেটা টের পেয়ে মনে মনে হাসলেন একবার। দাসকে পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে তিনি ফোন নামিয়ে বেতের আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন। সামনে জোর পার্টি চলছে। টালিগঞ্জের বিখ্যাত নায়কের নতুন ছবির মহরত আজ। চারদিকে হইচই, আনন্দ-উল্লাস! নতুন নায়িকা শিবানী সারা অঙ্গে হিল্লোল তুলে এইমাত্র বুদ্ধ ব্যানার্জির গালে একবার ঠোঁট লাগিয়ে চলে গেল। দৃশ্যটা ধরে রাখার জন্য জ্বলে উঠল আধ ডজন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।

বুদ্ধ ব্যানার্জি মন দিয়ে পার্টির উল্লাস প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। দাস যে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন, সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁকে পছন্দ করেন তিনি। দিল্লি হাই নিয়ে তাঁর আর ব্যস্ত থাকার কোনও মানেই হয় না। অচিরেই তাঁকে দেওয়া হবে নতুন দলের হয়ে নতুন কাজের দায়িত্ব। সে দলে দিল্লির কোনও ভূমিকা থাকবে না। সে দল তাঁর একার দল।

দলের নাম 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'।

ভাবতে ভাবতে মৃদু হাসি ফুটে উঠল বুদ্ধ ব্যানার্জির মুখে। তখন সেই পার্টি থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে থাকা দীননাথ চৌহানের মালিকের নতুন বাংলোতে দাসবাবুর হুইস্কির নেশা উড়ে গিয়েছে। বুদ্ধ ব্যানার্জির ফোনের কথাগুলো এবার একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন তিনি। কিন্তু তা রঞ্জিতকে বলা যাবে না আর।

।। ৭৪ ।।

ক্যাভেন্ডিসের শাগরেদ ভায়াগ্রা নিয়েছিল বোধহয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিঁড়ে খেল মুনমুনকে। অন্য কোনও মেয়ে হলে নির্ঘাত অচেতন হয়ে যেত। কিন্তু কামান্ধ পুরুষ সামলানোর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে শেষ পর্যন্ত বুনো শাগরেদটিকে নিঃশেষ করে দিয়ে কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করল।

ক্যাভেন্ডিস এতক্ষণ দরজার সামনে বসে তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। এবার তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে আবার ফিরিয়ে নিলেন মুখটা।

'খুকুমণির পারফর্ম্যান্সের প্রশংসা করতেই হচ্ছে।' বললেন তিনি, 'এর পর তোমাকে মেরে ফেলাটা অন্যায় হবে। তুমি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে লেখাপড়া করো। ফোনটা রেখে যাও। কাল সকালের আগে রাস্তায় বার হলে ওই সুন্দর দুটো বুকের একটায় বুলেট ঢুকে যাবে। দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যাবে।'

সারা শরীরে যন্ত্রণা। আঁচড়-কামড়ের দাগ। মুনমুন সব সহ্য করে নীরবে পোশাক পরে নিল। হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। কিন্তু তখনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল না সে। ধীরপায়ে ক্যাভেন্ডিসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'শুধু তোমায় নয়। ফ্ল্যাটটাও ছেড়ে দিচ্ছি।' মাথা দুলিয়ে জবাব দিলেন ক্যাভেন্ডিস, 'লাশ নিয়ে রাতেই বেরিয়ে যাব। তবে চিন্তা কোরো না খুকুমণি। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। শুনেছি তোমাদের দলের মেয়েগুলো সাংঘাতিক। তোমাদের সবাইকে আমার জ্যান্ত চাই। কাল যখন সুরেশ কুমারকে সব জানাবে, তখন এটাও জানিয়ে দিয়ো যে, ক্যাভেন্ডিস ইজ ইন অ্যাকশন। তবে ছেলেদের আমরা রেপ করি না। গুলি করি। আমার শাগরেদরা কেউ গে নয়।' বলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন ক্যাভেন্ডিস।

মুনমুনের শরীরটা শিউরে উঠল। সে একবার মৃত দীপকের দিকে তাকাল। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাটের দরজা খুলে। সুরেশ কুমারের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পথে কেউ তার বিধ্বস্ত চেহারাটা দেখে কিছু সন্দেহ করতেই পারত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একটা ফ্লোর সে একাই নেমে এল। নিজের ফ্ল্যাটের দরজাটা সে ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিল, যাতে আপতদৃষ্টিতে মনে হয় সে ভিতরেই আছে।

কিন্তু দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকার পরেই মুনমুনের মনে হল, ডাইনিং রুমে কেউ বসে আছে। তারপরেই সে খুব অবাক হয়ে দেখল সুষমাকে। কিন্তু নিজের ঠোঁটে আঙুল চেপে সুষমা কথা বলতে দিল না মুনমুনকে। সন্তর্পণে উঠে মুনমুনের কাছে এসে তার দুই কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছে তোমার সঙ্গে?'

মুনমুনের চোখ ফেটে জল আসছিল। কিন্তু জীবন যখন এমন, তখন আবেগ তো সামলাতেই হয়। সে কোনওমতে নিজেকে সংযত রেখে সংক্ষেপে খুলে বলল সব। সুষমা কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে থাকার পর ধরা গলায় বলল, 'তার মানে আজ রাতে দীপক ছেলেটার লাশ নিয়ে ভেগে যাবে এখান থেকে। কিন্তু বেজন্মাটা জানে না যে আমি এখানে, আর আমার কাছে একটা ফোন আছে।'

'সুরেশ কুমারকে জানিয়ে দেবে?' মুনমুন জানতে চায়, 'কিন্তু তুমি এখানে এলে কেন?'

'একটা আনএক্সপেক্টেড সোর্স থেকে ক্যাভেন্ডিসের শিলিগুড়ি আসার খবরটা সুরেশ কুমার পেয়েছে। পেয়েই আমাকে বলেছে তোমার সঙ্গে গিয়ে থাকতে। কিন্তু আমি এসে দেখি তুমি নেই। আর দরজা ভেজিয়ে রাখা। বুঝলাম তুমি কাজে গিয়েছ। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, ক্যাভেন্ডিস কাল সকালের আগে এই ফ্ল্যাটে আসবে না।'

কথাগুলো বলে সুষমা ফোনে সুরেশ কুমারকে ধরতে ধরতে মুনমুনের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'ফ্রেশ হয়ে এসো। এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।'

মুনমুন নীরবে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। সুষমা যে তাঁর ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছে— এটা ক্যাভেন্ডিস জানেন না। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, বাইরে তাঁর লোক নজরদারিতে রয়েছে। সুষমাকে হয়ত আবাসনে ঢুকতেও দেখেছে তারা। কিন্তু সন্দেহ করেনি। সুষমার কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর নিশ্চয়ই সুরেশ কুমার লোক লাগিয়ে ক্যাভেন্ডিসকে ট্র্যাক করতে শুরু করবে। কিন্তু ক্যাভেন্ডিসকে আজ যেভাবে দেখেছে মুনমুন, তাতে মনে হয় না তাঁকে বাগে পাওয়াটা সোজা হবে। সে মুনমুনকে ছুঁয়েও দেখেনি। এই জগতে নারীশরীর হাতের নাগালে পেয়েও যারা উপেক্ষা করতে পারে, তাদের খাটো করে দেখাটা বোকামি।

স্নান করে, গরম দুধ খেয়ে ঘণ্টাখানেক পর মুনমুন সামান্য তাজা বোধ করল। এর মধ্যে সুরেশ কুমারকে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে সুষমা। সুরেশ কুমার মুনমুনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ক্যাভেন্ডিসের সন্ধান পেয়ে। সে জানিয়েছে যে, ক্যাভেন্ডিসকে কতটা ট্র্যাক করা যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর শাগরেদটিকে শেষ পর্যন্ত নজরে রাখা হবে, এবং প্রথম সুযোগেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে পৃথিবী থেকে। এর ফলে দুটো কাজ হবে একসঙ্গে। মুনমুনের হয়ে প্রতিশোধ নেওয়া এবং ক্যাভেন্ডিসকে একটা বার্তা দেওয়া। তবে সুরেশ কুমারের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত যেন মুনমুন আর সুষমা ফ্ল্যাটের বাইরে পা না রাখে।

ঘণ্টা দেড়েক পর দেখা গেল, চারজন লোক আবাসনে এল একটি ফ্ল্যাটের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। তাদের সঙ্গে একটা ছোট ট্রাক। আবাসনের রক্ষী ফোন করে জানল যে, সি ফোর-এর ভাড়াটে মিস্টার

ক্যাভেন্ডিস ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছেন। লোকগুলোকে যেন উপরে আসতে দেওয়া হয়। আরও কিছুক্ষণ পর লোকগুলো অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে একটা বড় হোল্ড অল টাইপের জিনিস সাবধানে নামিয়ে এনে তুলে দিল ট্রাকে। বোঝাই গেল না যে, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা মৃতদেহ। সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের কম সময়ে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাক সমেত চারজন লোক। তাদের সঙ্গে সওয়ার হল ক্যাভেন্ডিসের শাগরেদ। এর মিনিটকয়েক বাদে হেলতেদুলতে আবাসন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ক্যাভেন্ডিস। একটা ছোট গাড়ি এসে তাঁকে তুলে নিল। খানিক দূর থেকে সুরেশ কুমারের লোক সবকিছু লক্ষ করে কাউকে ফোনে কিছু নির্দেশ দিল।

।। ৭৫ ।।

সেই রাতে রিসর্টে শরীরের নেশায় শুক্লা দাসকে প্রতিশ্রুতি দিলেও কনক দত্ত নামের এক রিটায়ার্ড পুলিশকে সে কেন চমকে দিতে যাবে— এটা নবেন্দু মল্লিক ঠান্ডা মাথায় ভেবে পাচ্ছেন না। সেই পুলিশের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। ধূপগুড়িতে থাকেন। কোনও দল করেন না। চরিত্রেও কোনও দোষ পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য ধমকানো-চমকানোর জন্য দোষত্রুটির ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ধূপগুড়িতে কনক দাসকে চমকে দেওয়াটাও বাঁয়ে হাত কা খেল। কিন্তু শক্তি থাকলেই যে অপচয় করতে হবে, তার কী মানে? আর শুক্লা দাসও যে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে দিনের পর দিন তা কি কনক দত্তকে গরম দেওয়ার জন্য?

এসব ভাবতে গেলে কোথায় জানি তাল কেটে যায় নবেন্দু মল্লিকের। দিন এখন তাঁর কাটছে সোনার মতো। তাঁর প্রাপ্তির ভাঁড়ার ক্ষণে ক্ষণে ভরে উঠছে আজকাল। শুক্লা দাসের শরীর হল সেই প্রাপ্তির ষোলো নম্বর কলা। নবেন্দু মল্লিক ভাবছেন যে, জলপাইগুড়িতে একটা ফ্ল্যাট কিনে সেখানে পাকাপাকিভাবে রেখে দেবেন শুক্লা দাসকে। কাজ-টাজও একটা জুটিয়ে দেওয়া যাবে তার সঙ্গে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে ঘুরে-ফিরে একটা প্রশ্নের সামনেই ফিরে আসছেন তিনি। কী চায় শুক্লা দাস? মেয়েরা স্বেচ্ছায় শরীর দেয় ভালবেসে কিংবা বিশেষ কোনও উদ্দেশে। এ ক্ষেত্রে ভালবাসার কোনও ব্যাপারই নেই। স্রেফ 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি এবং শুক্লা দাসের 'টেক' নিয়ে কোনও কিছু অনুমান করতে পারছেন না নবেন্দু মল্লিক।

দুটোর সময় জেলা আপিসে উচ্চ মাপের নেতার সঙ্গে দেখা করার কথা নবেন্দু মল্লিকের। এই নেতাটিকে একটু এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করেন তিনি। কয়েকদিন আগে শিলিগুড়িতে একটা সম্মেলনে নবেন্দু মল্লিক একেবারে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন এই নেতাটির। তিনি স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড তাঁকে মেপে নিয়ে বলেছিলেন, 'খবর রাখছি কিন্তু।' কথাটা সামান্য। কিন্তু শোনার পর নবেন্দুর মল্লিকের বেশ অস্বস্তি হয়েছিল। আজ তিনি একান্তে কথা বলার জন্য হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন শুনে তিনি বেশ চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। পরে নিজেকে এই ভেবে বুঝিয়েছেন যে, এটাই হওয়ার ছিল। তাঁর গুরুত্ব বাড়ছে। উঁচু মাপের নেতাদের সঙ্গে মিটিং-এ তো বসতেই হবে। কিন্তু এইরকম ভাবনার পরেও অস্বস্তি কাটছিল না নবেন্দু মল্লিকের। তাই পার্টি আপিসে বসে শুক্লা দাসকে নিয়ে ভাবছিলেন নিজেকে হালকা রাখার জন্য। সেখানেও জটিলতা চলে আসায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালেন।

একটু পরেই জেলা আপিসে সাড়া জাগিয়ে নেতার দুধসাদা গাড়িটা এসে থামল। মিনিট দশেক পর ডাক পড়ল নবেন্দু মল্লিকের। ছোট মাপের অ্যান্টি চেম্বারে নেতা মোবাইলে কিছু একটা দেখছিলেন। নবেন্দু মল্লিককে ঢুকতে দেখে ইশারায় বসতে বললেন। কয়েক মিনিট মোবাইল নাড়াচাড়ার পর সেটটা টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে থাকলেন নবেন্দুর চোখের দিকে। নবেন্দুর অস্বস্তি শুরু হল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'কিছু বলবেন দাদা?'

'বুদ্ধ ব্যানার্জির কোনও নির্দেশ ফলো করলে সম্পূর্ণ নিজের দায় ও দায়িত্ব নিয়ে করবেন।'

নেতার কথায় নবেন্দু মল্লিক ঘাবড়ে গেলেন। থতমত খেয়ে বললেন, 'উনি তো দলের কোনও কাজের নির্দেশ দেন না দাদা!'

'সেটা আমি জানি। তিনি আপনাকে কোনও পলিটিক্যাল টাস্ক দেন না। কিন্তু আপনার জন্য উনি প্রভাব খাটিয়ে যাচ্ছেন নিয়মিত। হোয়াই?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইলেন নেতা, 'আপনার বয়স কম।' তিনি বলে চললেন, 'বুদ্ধ ব্যানার্জির ফাঁদে পা দিচ্ছেন কি না, সেটা ভাবুন। হাইকম্যান্ড কিন্তু ফাঁদে পা দেওয়াদের এবার আনইম্পর্ট্যান্ট করে দেবে বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ওর লোকদের আমরা ইগনোর করতে পারব না। তাই কামাই ধান্দায় হাত পড়বে না। কিন্তু পলিটিক্যালি জিরো হয়ে যাবে। আপনি কি সেটা চান?'

'না দাদা!' নবেন্দু মল্লিক বিচলিত বোধ করেন, 'আমি পলিটিক্স করতে চাই। কিন্তু দলে যে তাঁর খুব প্রভাব। তাঁকে কেউ না করে না!'

'করবেও না।' নেতা এবার মৃদু হাসলেন, 'বুদ্ধ ব্যানার্জির সব দলে সমান প্রভাব। তাঁকে আমরা গিলতে বাধ্য। তবে কেউ কেউ ইচ্ছে করলে উগরে দিতে পারে। দেখো সেটা তুমিও পারো কি না।'

'পারব দাদা!' খুব আবেগের সঙ্গে বলে দিলেন নবেন্দু মল্লিক। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে একচোট হেসে নিলেন নেতা। বেচারা যুব নেতাটি জানে না যে, বুদ্ধ ব্যানার্জির পেতে রাখা ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে রাজনীতি করার জন্য মুখোমুখি বসে থাকা নেতা কত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা জানার, তারা সবাই জানে, বুদ্ধ ব্যানার্জি আসলে রাজনীতিকে বাহন করে নিজের পথে চলেন। কিন্তু সেই পথটা যে ঠিক কী তা অজানা, অস্পষ্ট। তিনি যেন এক সমান্তরাল মুখ্যমন্ত্রী, যাঁর রাজ্যটা এই রাজ্যেই, কিন্তু সে রাজ্য আলাদা। অনুমান করা হয় যে, দেশে এমন বেশ কিছু সমান্তরাল মুখ্যমন্ত্রী আছেন, যাঁরা সবাই মিলে একটা সমান্তরাল দেশ চালান। কিন্তু কখনও তিলমাত্র অভিযোগের জায়গা তৈরি হয়নি বুদ্ধ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। মিডিয়া তাঁকে নিয়ে কিচ্ছু লেখে না, কেবল মাঝে মাঝে সিনেমার নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর ছবি ছাপে। তিনি থাকেন একটা মাঝারি মানের ফ্ল্যাটে। তিনি বিধায়ক তহবিলের পুরোটাই খরচা করেন কাজ করে। কোথাও কোনও দুর্নীতির অভিযোগ তোলে না বিরোধীরা। প্রতিবার ভোটের আগে অনুমান করা হয় যে, এলাকায় না থাকার কারণে এবার তিনি হারবেন। সে একটা বিচিত্র জীব।

কার সাধ্য তাঁকে না নিয়ে চলবে? কিন্তু এই নবেন্দু মল্লিক হল বুদ্ধ ব্যানার্জির নবতম শিকার। বুদ্ধ ব্যানার্জি চাইলে কিছুদিন শিকারকে স্বর্গে তুলে রেখে এমন হাওয়া খাওয়াবে যে, সে বেচারা ভুলেই যাবে সে কী! তারপর একটা সময় তাকে নামিয়ে আনবে মর্তে। শিকার তখন দেখবে যে, তার পলিটিক্যাল কেরিয়ার শেষ। বড়জোর পঞ্চায়েত লেভেলে একটু দাপট থাকবে। বাকি জীবনটা তাকে বুদ্ধ ব্যানার্জির অনুগত হয়েই থাকতে হবে। তবে বুদ্ধ ব্যানার্জি দেওয়ার ব্যাপারে কিপটে নন। নবেন্দু মল্লিক ভাল গাড়িই চড়বেন আজীবন।

'পারলে ভাল।' নেতা স্মিত হেসে বললেন এবার, 'এ নিয়ে আপনাকে দ্বিতীয়বার আমি কিছু বলব না। শুধু একটা কথাই জানতে চাইব। অনেস্টলি জবাব দেবেন। আপনি কি বুদ্ধ ব্যানার্জির ট্র্যাপে পা দিয়েছেন?'

'বুঝলাম না দাদা!'

'আপনাকে কি স্বর্গে তুলে দিয়েছে?'

নবেন্দু মল্লিকের আচমকা খুব ভয় হতে লাগল।

(ক্রমশ)

দেবপ্রসাদ রায়

।। ২৫ ।।

জাতীয় রাজনীতি থেকে এবার আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় পা দিতে চলেছেন লেখক। ইরাকের বাদ পার্টির সঙ্গে জাতীয় যুব কংগ্রেসের সম্পর্ক কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, তা নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে দলের পক্ষ থেকে লেখক এলেন ইরানে। প্রথম বিদেশ সফর। সেই সফরের সরস বর্ণনা এই পর্বে। ইরাক যাচ্ছেন শুনে ইন্দিরা গান্ধি লেখককে যা বলেছিলেন তা কিন্তু পরে মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে। কী বলেছিলেন তিনি?

রথ অপসারিত হবে তা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল। তবে একটা কেচ্ছা তার অপসারণকে ত্বরান্বিত করল। রানি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে রথের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তা নিয়ে ওর পরিবারে অনেক গোলমাল হয়েছে। শোনা যায়, ওর শ্যালক এই সম্পর্ক নিয়ে প্রতিবাদ করছিল বলে রথ তাকে এমন প্রহার করে যে, সে দেশে ফিরে গিয়ে আত্মহত্যা করে। যা-ই হোক, যাকে নিয়ে এত গোলমাল, একদিন সেই রানিই আত্মহত্যা করল। জানা গেল, ওর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এমন কিছু লেখা ছিল, যা রথের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারত। যদিও এইদিকটা ওর আস্থাভাজন সাধারণ সম্পাদক সরাবজিৎ সিং সামলে নিয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দিকটা সামলানো গেল না। রথের বিকল্প খোঁজা হচ্ছে, সেটা প্রায় 'কমন নলেজ' হয়ে দাঁড়াল। রথ যাবে, মানেকা না রাজীব গান্ধি আসবে— এই বাতাবরণে কংগ্রেসের যে অংশটা মূলত শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা মানেকার জন্য রীতিমতো রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করল। একদিকে 'সঞ্জয় বিচার মঞ্চ', অন্য দিকে খুশবন্ত সিং-সহ শিখ লবির তৎপরতা— সব মিলিয়ে দিল্লিতে যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে একটা উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হল।

আমি এর ভিতর কলকাতায় গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, চারদিকে ভীষণ তৎপরতা— কে দায়িত্ব পায়! সরাবজিৎ আমায় বলল, 'জানো, তোমার নাম নিয়েও আলোচনা হচ্ছে।' আমি বুঝলাম, ও আমায় বাজিয়ে দেখতে চাইছে। কারণ শিখ হওয়ার কারণে ও ইতিমধ্যেই মানেকা লবির লোক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। তাই আমি প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণ ছিল, ও যুব কংগ্রেসের বিদেশ শাখার (Foreign Affairs Department) ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে আমাদের ইরাক সফরের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল। সেটাই ছিল আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। পাসপোর্ট, ভিসা, ফরেন কারেন্সি— সবই সরাবজিৎ সামলে নিয়ে পালাম থেকে প্লেনে তুলে দিয়েছিল।

আমার মনে হল, সরাবজিৎ সুকৌশলে আমাকে মানেকার দলে টানতে চাইছে। আমি তাই ওকে পরিহাস করে বললাম, 'তা-ই নাকি? যুব কংগ্রেসের এত দুর্দিন চলছে?' ও বলল, 'আমি যা শুনেছি তা-ই তোমাকে বললাম।' আমি বললাম, 'যেটা হবে না, সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।'

এই টানাপোড়েনের ভিতর গুলাম নবি সভাপতি হল। সাংসদ হওয়ার সুবাদে ও ছিল 'ন্যাচারাল চয়েস' এবং পুরনো সেট-আপকে (সরাবজিৎ বাদে) অপরিবর্তিত রাখার ফলে আমরা সবাই যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই থেকে গেলাম। দল ক্ষমতায় আসাতে উঞ্ছবৃত্তিরও পরিসমাপ্তি ঘটল। এদিকে দল থেকেই ঠিক হল, আমরা যারা 'হোলটাইমার'— আমাদের মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। '৮০-র দশকের শুরু। ৫০০ টাকা একার জন্য খারাপ নয়। থাকবার ব্যাপারটাতেও পরিবর্তন এল।

কংগ্রেস দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার পরপরই হরিয়ানায় ভজনলালজি সদলবলে কংগ্রেসে চলে আসাতে হরিয়ানায় রাতারাতি কংগ্রেস সরকার গঠিত হল। ভজনলাল ছিলেন এমন

একজন মানুষ যে, নিজে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে থাকায় যেমন বিশ্বাস করতেন না, তেমনি অন্যদের জন্যও সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে ইতস্তত করতেন না। এই সময়ে হরিয়ানার সুরজকুণ্ডে যুব কংগ্রেসের একদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। আজকের মোদি সরকারের ইস্পাত মন্ত্রী চৌধুরী বীরেন্দ্র সিং তখন রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি। আমি গিয়েছিলাম বক্তা হিসেবে। তখনও হিন্দিতে তত সড়গড় হয়ে উঠিনি। তবুও ছেলেরা বলত, 'দাদা, তুমহারা টুটা হুয়া হিন্দি রসগুল্লা কি তরহ মিঠা লগতা হ্যায়।' কংগ্রেসের ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় ছিল। তার উপরই বললাম। ভজনলাল মঞ্চে ছিলেন। ওঁর কেন যেন আমাকে ভাল লেগে গেল। যখন জানলেন, আমার দিল্লিতে তখনও নিশ্চিতভাবে কোনও থাকার জায়গা নেই, উনি বললেন, 'তুমি হরিয়ানা ভবনে আমার অতিথি হয়ে থাকো। কোনও পয়সা লাগবে না।' আমি তো এক পায়ে খাড়া।

হরিয়ানা ভবনে ছিলাম চার মাস। দুটো ব্যাপার উল্লেখ করার মতো। এক, প্রতিদিন দুপুরে যখন খেতে আসতাম, তখন একটি সুন্দরী অল্পবয়সি মেয়েকে রিসেপশনে দেখতাম। ঘটনাচক্রে আমি যখনই চাবি নিয়ে যেতাম, ও তখন খাচ্ছে। আর, প্রতিদিনই বলতেন, 'আও রায় সাহাব, দো রোটি খা লো।' আমি হকচকিয়ে যেতাম। ভাল করে আলাপ-পরিচয় হল না, আর এক থালায় রুটি ভাগ করে খেতে ডাকছে— কী বলতে চায় আসলে! আমিও তখন সদ্য তিরিশ। ক'দিন কুণ্ঠার সঙ্গে 'না' বলে একদিন অরুণ সিং (সহকর্মী)-কে ব্যাপারটা বললাম। ও বলল, 'দাদা, ইসসে কোই মতলব মত নিকালো। ইয়ে উত্তর ভারত কি পরম্পরা হ্যায়। খানা খানেকে সময় কোই ভি আ জায়ে, তো উনহে রোটি পুছনা শরাফত মানা জাতা হ্যায়।' আমি শুধু আশ্বস্ত হলাম না। নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম যে, অন্য কথা ভেবে কখনও অন্য প্রস্তাব দিয়ে বসিনি! দুই, আমার রোজ রাতে ফিরতে একটু দেরি হত। এসে হাত-মুখ ধুয়ে যখন নিচে ক্যান্টিনে ফোন করতাম, খাবার পাওয়া যাবে কি না, নীচ থেকে জানাত— 'অভি তো ব্রিফ চিকেন মিলেগা।' শাকাহারীদের জন্য হরিয়ানাতে নিরামিষ খাবার শেষ হয়ে যেত তাড়াতাড়ি। শেষ পাতে চিকেন পড়ে থাকত। আমিও হতাশ গলায় বলতাম, 'তা-ই পাঠাও।' যেন চিকেন আমি বাধ্য হয়ে খাচ্ছি!

ইরাকে গিয়েছিলাম এই সময়টাতেই। আমি, গুলাম নবি, কেরলের বিজয়ন এবং মধ্যপ্রদেশের এমপি শিবেন্দ্র বাহাদুর সিং। যদিও প্রথমে কথা ছিল, ওখানে নন অ্যালাইন্ড ইয়ুথ সামিট হবে, কিন্তু তা স্থগিত হয়ে গেলেও ইরাকের 'বাদ' পার্টি বারবার চাইছিল, আমরা যাতে ট্রিপটা বাতিল না করি এবং এটাকে 'গুডউইল মিশন' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, যুব কংগ্রেসের সঙ্গে ইরাকের বাদ পার্টির যুব শাখার সম্পর্ক আরও কীভাবে ঘনিষ্ঠ করে তোলা যায়, তার জন্য একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।

খোমেইনি আসলে খোমেইনি নয়। ও ছদ্মবেশে হিটলারের সহচর রুডল্ফ হেস। ওকে কখনও আন্তর্জাতিক আদালতে তোলা যায়নি। কারণ ও কখনও ধরা পড়েনি। অত গভীরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বোঝার মতো পরিপক্কতা তখনও আসেনি। তাই নীরবে শুনতাম, আর বলার সময় হলে ওদের আতিথ্য, প্রকৃতির বিরূপতা সত্ত্বেও ওদের উন্নতি— তার প্রশংসা করতাম। একটা মরুভূমির দেশ— তাকে আধুনিক করে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাফল্য— তা মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। কী বাগদাদ, কী বসরা, কী কারবালা— সর্বত্রই আধুনিকতার ছোঁয়া।

ইরাক যাব শুনে বীরেনদা বলল, 'না-যাওয়া পর্যন্ত কাউকে বলিস না। তোর তো শত্রুর অভাব নেই। কেউ গিয়ে ভাংচি দিয়ে তোর নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবে।' তাই উচ্ছ্বাসটা চেপেই রাখলাম। যে দিন যাব, সে দিন ইচ্ছে করেই রামদার বাড়ি থেকে সবাইকে জানান দিয়ে রওনা দেব ঠিক করলাম, যদিও তখনও হরিয়ানা ভবনে থাকছি। যাবার দিন সকালবেলা ইন্দিরাজির কাছে আশীর্বাদ নিতে যাওয়া হল। উনি বললেন, 'ডোন্ট গেট শট, ওয়ার উইল বিগিন সুন।' ঠিক তা-ই হল। আমরা ফিরে আসার পরেই ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু হল। যা-ই হোক, উত্তেজনা যে চলছে, সেটা সফরের সময়েই বোঝা গিয়েছিল। কারণ, যতগুলি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে— সবটাতেই ইরাকি পক্ষ ইরানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে কথা বলত। ইরাকের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' তারিক আজিজ (পরে ওঁর ফাঁসি হয়) একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন। খোমেইনি আসলে খোমেইনি নয়। ও ছদ্মবেশে হিটলারের সহচর রুডল্ফ হেস। ওকে কখনও আন্তর্জাতিক আদালতে তোলা যায়নি। কারণ ও কখনও ধরা পড়েনি। অত গভীরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বোঝার মতো পরিপক্কতা তখনও আসেনি। তাই নীরবে শুনতাম, আর বলার সময় হলে ওদের আতিথ্য, প্রকৃতির বিরূপতা সত্ত্বেও ওদের উন্নতি— তার প্রশংসা করতাম। একটা মরুভূমির দেশ— তাকে আধুনিক করে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাফল্য— তা মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। কী বাগদাদ, কী বসরা, কী কারবালা— সর্বত্রই আধুনিকতার ছোঁয়া। তবে ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান দেখে হতাশ হয়েছিলাম।

যে দিন সাদ্দাম হোসেন লাঞ্চে আমন্ত্রণ জানালেন, সে দিন খুবই উত্তেজনা বোধ করছিলাম। কারণ, ইরাকে তখন সাদ্দাম আর সাদ্দাম। রাস্তায়, টিভিতে, হোটেলে— একটা লোকেরই ছবি শোভা পাচ্ছে সর্বত্র। দোভাষীর মাধ্যমে আলাপচারিতা। আর একটা আস্ত ভেড়াকে রোস্ট করে টেবিলে রাখা। একটা চপার দিয়ে কেটে কেটে প্লেটে তুলতে হচ্ছে।

যা দেখে গর্ববোধ হচ্ছিল, তা হল ভারতীয়দের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা। ইরাকের সমস্ত স্পর্শকাতর জায়গাতে নির্মাণকাজের দায়িত্ব ভারতীয় কোম্পানি ইপিআই-কে দেওয়া ছিল। পৃথিবীর আর কোনও দেশকে এত বিশ্বাসযোগ্য বলে ওদের মনে হয়নি।

যে কোনও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় শিবেন্দ্র বাহাদুর সিং টেবিলে রাখা ফল দেখিয়ে বলত, এই ফলটা কি তোমাদের এখানে হয়? অথবা ঘরের টিভিটা দেখিয়ে বলত, এই টিভি কি তোমরা বানিয়েছ? যে-ই বলত, হ্যাঁ। ও বলত, 'গপ্ মার রহে হ্যাঁয়।' ওরা বুঝত, কোনও একটা কথা বলা হল, যেটা ওদের কাছে শ্রুতিমধুর নয়। তাই মুখে অসন্তোষের ভাব নিয়ে আলোচনা চালু রাখত।

শিবেন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে আমার বয়সের অনেক তফাত ছিল। তার উপর ওর মাথায় বিরাট টাক। আমি একদিন মজা করে বললাম, ইরাকিরা আমায় জিজ্ঞেস করছে যে, তুমি কি আমার বাবা হও? তারপর থেকে যতদিন যোগাযোগ ছিল, আমি ওকে 'ড্যাডি' বলে ডাকতাম, আর ও আমাকে 'সানি' বলে ডাকত।

(ক্রমশ)

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

।।৪০।।

খুদিদার বাড়ির পিছন দিয়ে বেরিয়ে একটা জলমগ্ন মাঠের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় ওঠার শর্টকাট আছে। তিনজনের ছোট্ট দলটা সেই রাস্তা দিয়ে সাবধানে হাঁটতে শুরু করল। রাত প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। খুব হালকা আলোর আভাস ফুটে উঠছে আকাশে। টানা চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে ঝরে পড়ার পর ঘণ্টাখানেক হল বৃষ্টিটা থেমেছে। আকাশে মেঘের স্তরটাও কিছুটা হালকা দেখাচ্ছিল। তিনজনের দলে হিদারু ছাড়া বাকি দু'জন তারিণী বসুনিয়ার নির্দেশে হুসলুডাঙা থেকে গতকাল সন্ধেবেলা এসে উঠেছিল খুদিদার বাড়িতে। গত দু'দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে শহর জবুথবু। তিস্তা ফুলেফেঁপে বইছে। করলার জল প্রায় পাড় ছুঁইছুঁই। কাল যখন লোক দুটো খুদিদার বাড়িতে এল, তখন বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছিল চারপাশ। কিন্তু তারিণী বসুনিয়ার নির্দেশ ছিল যে, দুর্যোগ থাকলেই টাউনে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে। ধরা পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকবে তখন।

বাস্তবিকই বড় রাস্তায় কোনও টহলরত পুলিশ চোখে পড়ল না। এ রাস্তায় বাতি নেই। প্রায় একশো গজের মতো রাস্তা পার হলেই আবার গলিপথে ঢুকে পড়বে ওরা। দু'পাশ ভাল করে দেখে নেওয়ার জন্য হিদারু ঘাড় ঘোরাল। বাকি দু'জন তখন তার হাত ধরে টেনে পিছিয়ে দিল খানিকটা। বেগুনটারির দিক থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি আসছিল দেখেই সাবধান হল ওরা। সম্ভবত কোনও বাবু নিশাভিসার সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। টাউনে এমন বাবুর সংখ্যা যথেষ্ট।

আলো আরও একটু ফুটেছে। পিছনে সোনাউল্লার স্কুলবাড়িটা দেখা যাচ্ছিল ছায়ার মতো। তার পাশে নিচু খেত। বাবুর গাড়ি টগবগিয়ে বেরিয়ে যেতেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করল তিনজন। বড় রাস্তা ছেড়ে কয়েকটা নিম, আম, কাঁঠাল গাছ এবং বাঁশঝোপের মাঝখান দিয়ে কাঁচা গলিপথ চলে গিয়েছে করলা নদীর দিকে। ওরা নদীর সমান্তরালে হাঁটতে শুরু করল। পথের এক হাত নিচে করলার জল পাক খেয়ে ছুটে যাচ্ছে কিং

সাহেবের ঘাটে তিস্তার সঙ্গে মিলবে বলে। এবার দেখা গেল, সেই জল বেয়ে বেশ দক্ষতার সঙ্গে একটা নৌকো চালিয়ে কেউ একজন পাড়ে আসার চেষ্টা করছে। নদীর ওপার থেকে কোনাকুনি আসছিল নৌকোটা। দেখতে পেয়ে হিদারুরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গী দু'জনের একজন হিদারুর জিনিসপত্রে ঠাসা হোল্ড অলটা কাঁধে নিয়েছিল। দ্বিতীয়জনের হাতে ছিল একটা ছোট লাঠি, যেটা দিয়ে সে বাঘ মেরে দিতে জানে।

নৌকোর মাঝি পাড়ের কাছাকাছি এসে একগুচ্ছ দড়ি ছুড়ে দিল ডাঙার দিকে। দ্বিতীয়জন সেটা ধরে নিয়ে টানতে লাগল আস্তে আস্তে। এই স্রোতে নৌকো পাড়ে এনে দাঁড় করানোর জন্য দড়ির ব্যবস্থা। নৌকো মোটামুটি স্থির হতেই হিদারু লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। এই মুহূর্তে সে হল নায়ক। তাকে জলপাইগুড়ি থেকে বার করে নিয়ে, তিস্তা পার করিয়ে, দোমোহানির উত্তর দিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, চা-বাগানের জন্য রসদ নিয়ে যাওয়া একটা দলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ধাপে ধাপে অপেক্ষা করে আছে বেশ কয়েকজন দক্ষ লোক। এরা সবাই তারিণী বসুনিয়ার শাগরেদ। কিন্তু তাঁর লোকেরা হিদারুকে টাউন থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারলেও সে কোথায় যাবে, সেটা হিদারুর ব্যাপার। বস্তুত সে কোথায় যাবে, সে বিষয়ে খুদিদাও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তিনি চাইছিলেন যে, হিদারু কোনও চা-বাগান এলাকায় ছদ্ম পরিচয়ে কোনও একটা কাজ খুঁজে নিয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকুন। হিদারু খানিকটা লেখাপড়া জানে। কাজ পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না, কিন্তু তার জন্য চাই কোনও একটা রেফারেন্স।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় সবকিছু শুনে একটা উপায় করে দিয়েছেন। তিনি গুমরু প্রসাদ নামের একজনের খোঁজ দিয়েছেন, যে চা-বাগানের বাবু এবং সাহেবদের জন্য হরেক মালপত্র নিয়ে যায় টাউন থেকে। সে বাগানের হাটে হাটে ব্যবসাও করে। গুমরুর কাছে কোনও এক কাঠ চেরাই কলের মালিক একজন খাতা লিখতে জানা কর্মীর খোঁজ চেয়েছেন। হিদারুকে সে ওই মালিকের কাছে নিয়ে যাবে। তারিণী বসুনিয়ার লোকেরা হিদারুকে ভিড়িয়ে দেবে গুমরু প্রসাদের দলে। সে বেশ কিছু গোরুর গাড়ি বোঝাই করে গুটিকয় লোক নিয়ে চলেছে পাহাড়ের দিকে। কাঠের কল তাঁর যাত্রাপথেই পড়বে। সবকিছু ঠিকমতো চললে আগামীকাল কিংবা পরশু গুমরু প্রসাদের দলটাকে লাটাগুড়ি থেকে চালসার মাঝে কোথাও পেয়ে যাবে হিদারুরা।

করলা পেরিয়ে রাজবাড়ির দিঘির উত্তর দিকের গাছপালা ঝোপজঙ্গলে ভরা এলাকাটার মধ্যে দিয়ে ওরা তিনজন তিস্তার সমান্তরালে হাঁটতে লাগল। ইটের রাস্তা তিস্তার পাড় ঘেঁষে দোমোহানি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সেখানে যাওয়ার ঘাট থেকে গোরুর গাড়ি আসতে শুরু করেছে এর মধ্যেই। লোক চলাচলও শুরু হয়ে যাবে। এই কারণেই সে রাস্তা না ধরে অগভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। দোমোহানির ঘাট পেরিয়ে আরও খানিকটা উত্তরে যাওয়ার পর নদী পার হবে। ভরপুর তিস্তা প্রচণ্ড ফুর্তি নিয়ে গর্জন তুলে বয়ে চলেছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। সূর্য ওঠার সময় হয়ে এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল। কাদাজলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ চলে গিয়েছে। হাঁটা সহজ ব্যাপার নয়। কখনও লাফাতে হচ্ছে। হিদারু বুঝতে পারল যে, যত তারা এগচ্ছে, জঙ্গল তত ঘন হয়ে আসছে। এই জঙ্গল থেকে প্রায়ই বাঘ চলে আসে শহরে। এতদিন সে জঙ্গলের গল্প শুনে এসেছে বড়দের কাছে। এবার সে প্রথম টের পাচ্ছে জঙ্গলকে। কিন্তু আসল অরণ্য শুরু হবে তিস্তা পার হওয়ার পরে। গভীর এক অরণ্যের ভিতর দিয়ে তারা উঠবে লাটাগুড়ির রাস্তায়। তাকে গগনেন্দ্র কতদিন শুনিয়েছে ডুয়ার্সের অরণ্যের কাহিনি। হিদারু জানে যে, জঙ্গল বছরে দশ মাস জলে বা হিমে ভিজে থাকে। অতিকায় সব বৃক্ষ সার সার দাঁড়িয়ে আটকে দেয় চলার পথ, সূর্যের আলো। কত সব নাম-না-জানা রংবেরঙের পাখি উড়ে বেড়ায় ঠান্ডার দিনে নেমে আসা পাহাড় থেকে। জানোয়ারের কথা ছেড়ে দাও— তাদের তো শরীর আছে। কিন্তু সেইসব সাদা কাপড় পরা ছায়াদের কারও শরীর নেই। এরাও ঘুরে বেড়ায় সেই অরণ্যে, ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাতে। গগনেন্দ্র কিংবা তার বাবা রাজীবলোচন এসব দেখেনি, কিন্তু হিদারুর ঠাকুরদা দেখেছে।

আগে থেকে ঠিক করে রাখা অপেক্ষাকৃত বড় একখানা নৌকোয় তিস্তা পেরিয়ে গেল হিদারুরা। চারদিকে ঝকমকে সকাল। মেঘ দ্রুত সরে যাচ্ছিল। নদী পেরুতে পেরুতেই হিদারু দেখল, পরিষ্কার হয়ে গেল উত্তরের আকাশটা। চোখের সামনে ঝকঝক করে উঠল এক টুকরো তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গ। টাউন থেকে এই চুড়ো অনেকদিন দেখেছে হিদারু। কিন্তু এখন চোখ ফেরাতে পারছিল না। এমন বিপুল দিগন্তজোড়া পর্বতের আভাস সে টাউন থেকে কখনও পায়নি। বিপুল বিস্তৃত ভরা তিস্তার বুকে নৌকোয় বসে চোখের সামনে বিরাট এক পৃথিবীর অস্তিত্ব এই প্রথম প্রত্যক্ষ করতে পারছিল হিদারু। সেদিকেই তাকিয়ে থাকছিল অবাক চোখে। তারপর তিস্তা পেরিয়ে সে হাজির হল প্রকৃত অরণ্যের সামনে। যেন এক বিপুল ছায়া বহু জন্মের রহস্য নিয়ে থম মেরে আছে। এগিয়ে যেতে যেতে বোঝা যায় যে, গাছেরা নিঃশব্দে দলে দলে ব্যূহ রচনা করে ঘিরে ফেলছে অনুপ্রবেশকারীকে। তার মধ্যে দিয়েই বুঝে নিতে হবে সরু এক পায়ে চলা পথ। স্যাঁতসেঁতে মাটি, পচে যাওয়া পাতা, পাতা থেকে টুপ টুপকরে পড়া জল, ছোট ছোট জলধারা, ছলছল শব্দে ছোটা একটা নদী।

অরণ্যের পথে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একটা স্রোতার কাছে ওরা থামল। এখন নিশ্চিন্তে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। সকলের শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। সঙ্গে থাকা চিঁড়ে আর গুড় পেটে দিয়ে তাজা হতে হবে। তা ছাড়া জোঁক ছাড়ানোর ব্যাপার আছে। সেসব সেরে হিদারু হোল্ড অল খুলে গামছে বার করে হাত-মুখ ধুয়ে একটা পাথরের উপর বসল। মাঝে মাঝে তার সবকিছু অবিশ্বাস্য লাগছিল। চোখে-মুখে জল দেওয়ার পর অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সত্যিই সে চলেছে কাঠ চেরাই কলে খাতা লেখার কাজ পাওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে সে লাটাগুড়ি থেকে তিন ক্রোশ দূরে গভীর এক অরণ্যে। সামনেই দু'জন বিশ্বস্ত লোক মন দিয়ে পরিষ্কার এক টুকরো কাপড়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছে। হিদারুকে মাঝখানে রেখে লাইন করে এসেছে জঙ্গলের পথ ধরে এতক্ষণ। হাঁটতে হাঁটতে নানান গল্প শুনিয়েছে। পায়ে-চলা পথ হঠাৎ হারিয়ে যায়। একবার ভুল হলে জঙ্গলের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে দিনের পর দিন। কিন্তু ওদের ভুল হয় না। হিদারুর মনে হচ্ছিল যে, এই পথটা ওদের মুখস্থ। অনেকদিন আগে এই পথ দিয়েই নাকি কোচবিহারের রাজার গুপ্তচররা ভুটানিদের খবর নিয়ে রাজধানীতে ফিরত। এখনও সাহেবরা এই রাস্তাটার খবর জানে না।

'চূড়া খান।'

হিদারু দেখল, শালপাতায় মুড়ে ভেজা চিঁড়ে আর গুড় তার সামনে ধরেছে একজন। সেটা হিদারু প্রায় গপগপিয়েই খেল। তারপর স্রোতার টলটলে জল খেল প্রাণ ভরে। এবার সে অনেকটাই নিজেকে ফিরে পাচ্ছে। পরিশ্রম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হিদারু কবে পরিশ্রমে ভয় পেল? কয়েক ঘণ্টা অরণ্যের মধ্যে থাকার পর সে বুঝতে পারছে যে, গাছপালার এই মহাকোলাহলের মধ্যে দিয়েও যাওয়া সম্ভব। পুলিশের নাকে ঘুসি বসিয়ে দেওয়ার পর থেকে কত লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে! তারিণী বসুনিয়ার মতো লোক নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে হিদারুকে টাউন থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য! ক্ষত্রিয় সমিতির ছেলেরা

গোপনে গোপনে যোগাযোগ করে কাজটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে! এর কোনও কিছুই মিথ্যে নয়। সব সত্যি!

হিদারু সোজা হয়ে দাঁড়াল। টাউনের অনেক ছেলে দেশের জন্য কষ্ট করছে। সেই তুলনায় এই অরণ্যপথ অধিক বন্ধুর নয়। সে দু'পাশে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'বন্দে মাতরম্!'

ওরা দু'জন চিঁড়ে খাওয়া থামিয়ে একটু অবাক হয়ে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করল একই শব্দ। তক্ষুনি হিদারুর শরীরে সঞ্জীবিত হল অপূর্ব এক উদ্দীপনা। ছায়া ছায়া রহস্যের আড়ালে থাকা গভীর থমথমে অরণ্য আচমকাই হয়ে উঠল ভারী মায়াময়। হিদারু দেখল, হালকা রোদ্দুরের ফালি এসে পড়েছে স্রোতার ওপারে গাছগুলির মাথায়। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে একটা ধনেশ পাখিকে শান্তভাবে বসে থাকতে। সামনেই ফুটে আছে অজস্র ছোট সাদা ফুল। বিশাল বিশাল কচুপাতায় টলটল করছে খানিকটা করে জল। দেখে আনন্দিত হল হিদারু। কয়েকদিনের উদ্‌বেগ পলকে মুছে গেল তাঁর মন থেকে।

তখন লাটাগুড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল গুমরু প্রসাদের বাহিনী। পরপর গোরুর গাড়িতে বোঝাই করা হরেক জিনিস। বেশির ভাগই শৌখিন আর দামি জিনিস। সঙ্গে তাই বন্দুকধারী, লাঠিয়ালরাও চলেছে। লাটাগুড়িতে এসে আরও দুটো দল মিলেছে গুমরু প্রসাদের সঙ্গে। সামনে গভীর জঙ্গল। পথ গিয়েছে সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝেই হাতির দল এসে পড়ে পথের উপর। বাঘ নিয়ে খুব একটা চিন্তা করেন না গুমরু প্রসাদ। কিন্তু হাতি বড় ভয়ানক জীব।

গুমরু প্রসাদকে বলা হয়েছে যে, লাটাগুড়ির পরে এক বাবু এসে দলের সঙ্গে যোগ দেবে। তাকে খাতির করে পৌঁছে দিতে হবে কাঠ চেরাই কলে। কিন্তু সে ঠিক কোথায় এসে যোগ দেবে, সেটা নিশ্চিত করা হয়নি। গুমরু প্রসাদ তাই মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাচ্ছিলেন। বাবুটি তাড়াতাড়ি চলে এলে ভাল হয়। গুমরু প্রসাদ কিছু আলোচনা করতে পারেন। লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে আলোচনা করলে বুদ্ধি খোলে। বাবুকে নিজের গাড়িতে তুলে গল্প করতে করতে গেলে হাতির চিন্তাটাও ভুলে থাকা যাবে।

বাবুর আবির্ভাবের আশায় ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলতে লাগলেন গুমরু প্রসাদ।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

গাঙ্গুটিয়ার সনৎদা

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

কবে থেকে ডুয়ার্সের পথে পথে চরৈবেতির আনন্দে পথ চলা, জানা নেই। আমার মতন ডুয়ার্সকে ভালবেসেছেন অনেকে। কেউ বলেছেন মোহময়ী, রূপসি, রূপলাবণ্যে ভরা ডুয়ার্স। ডুয়ার্স মানে জঙ্গল, চা-বাগান, পাহাড়, নানা ভাষাভাষীর মানুষজনদের বসবাস। ফ্লোরা ও ফনার স্বর্গরাজ্য। লেখক, কবি, শিল্পী, পরিব্রাজক, সাংবাদিক, ভ্রামণিকের পাঁচালিতে ডুয়ার্স উদ্ভাসিত। ক্যালাইডোস্কোপিক রঙে-রূপে নানাভাবে বর্ণময়। দেশ-বিদেশের পর্যটক ডুয়ার্সে দু'-চার দিন থেকে শুধুমাত্র ছুঁয়ে যান। জিপসিতে সাফারি, হাতি, গন্ডার, বাইসন দর্শন— নানারকম অভিজ্ঞতা। ইদানীং ছায়াছবির তারকারা শুটিং লোকেশন হিসেবে বেছে নিচ্ছেন নির্জন ডুয়ার্সের বনপ্রান্তর, নদী, ঝোরা, খোলা ঝরনা। কেউ কেউ বিভিন্ন জনজাতির অন্দরমহলে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আগ্রহী। ভাল লক্ষণ। এত কিছুর পরও ডুয়ার্স কিন্তু অদেখা-অচেনাই থেকে যায়।

ডুয়ার্স অরণ্যে, চা-বাগিচায়, ছোট্ট জনপদে এমন মানুষ আছেন, ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, যাঁরা ডুয়ার্সকে ভালবেসে কোথাও নাড়াবাঁধা হন না। প্রচারের আলোতেও যেতে পারেন না। দক্ষিণবঙ্গ কেন, রাজধানী কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল, যাঁরা ডুয়ার্স নিয়ে লম্ফঝম্প, বাদ্যি-বাজনা, কফি হাউস তোলপাড় করছেন, তাঁরাও ডুয়ার্সের গুণী মানুষগুলিকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত করছেন না। চলতে চলতে দু'চোখ ভরে ডুয়ার্সের ল্যান্ডস্কেপ, সুবিশাল প্যানোরমা। দুর্দান্ত ডাইমেনশনকে দেখেছি, তেমনি চেষ্টা করেছি হৃদয় দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে ডুয়ার্সের আপনজনদের সান্নিধ্য পেতে। এমনই একজন ডুয়ার্সপ্রেমী গাঙ্গুটিয়া চা-বাগানের কবি সনৎ চট্টোপাধ্যায়। আমাদের সকলের প্রিয় বুড়োদা।

'রৌরেমন', 'রাঙালীবাজনা', 'কাকজ্যোৎস্নায় কালজানি'— অসংখ্য কবিতা, কাব্যগ্রন্থ বাংলা, সাদরি, নেপালি ভাষায় লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন সুদীর্ঘ বছর ধরে 'উন্মেষ' পত্রিকা। প্রত্যন্ত চা-বাগান, যেখানে পাঁচ পয়সার বিপণন নেই, আছে শুধুমাত্র নেশা— পত্রিকা করার। দুঃখ-দারিদ্র, হতাশা, অভাব, অনশন যখন তাঁর নিত্যসঙ্গী, তখনও দেখেছি প্রাণখোলা উদার হৃদয়, আন্তরিক আতিথেয়তা। সনৎদার সঙ্গে পরিচয় যৌবনে। আলিপুরদুয়ারে জগন্নাথদার কাঠের দোতলায় তখন আমার অস্থায়ী ঠিকানা। বাউন্ডুলে ভবঘুরে জীবনে স্কুলের চাকরি জুটে গেলেও মনোবাসনা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। জগন্নাথদাই একদিন বললেন, 'চলেন কালচিনি। সেখান থেকে গাঙ্গুটিয়ায় সনতের ওখানে। আপনি যাচ্ছেন, সেই বার্তাটুকু পৌঁছে গিয়েছে।'

কালচিনির বাতলায় নেমে জগন্নাথদা পান কিনলেন। তারপর কিছুক্ষণ দিক নির্ণয় করে বললেন, 'চলুন চা খাওয়া যাক।' বলে আরএসপি অফিসে প্রবেশ করেন। জগন্নাথদাকে কোনও দিন রাজনীতি, দলাদলি নিয়ে আলোচনা করতে দেখিনি, শুনিনি। অফিসে ঢোকামাত্র স্থানীয় কমরেডরা এক বাক্যে— 'আরে জগন্নাথদা, কতকাল বাদে দেখা।' আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁর সঙ্গে পরিচয় আছে? উত্তরবঙ্গের মস্ত বড় লেখক।' শুনে আমার ভীষণ অস্বস্তি। দূর ছাই, আমি আবার কবে লেখক হলাম। চা-বিস্কুট আর রাজনীতি চর্চা করে আবার সেই বটতলা। দু'পা গেলে লেবেল ক্রসিং, ডান দিকে ভাতের হোটেল। উলটো দিকে কাবুলিওয়ালাদের ঠেক। বড়সড় মিষ্টান্নভাণ্ডার। যা-ই হোক, জগন্নাথদা বললেন, 'আমি আর যাব না। দমনপুরে রুক্মিণীদার বাড়িতে যেতে হবে। 'বনমহল' পত্রিকার লেখাপত্র সাজিয়ে প্রেসে দিতে হবে।' উনি একটা রিকশা ডেকে আমাকে বসিয়ে বিদায় নিলেন। রিকশাচালক বলে, 'বুড়াবাবুকো হম পহচানতে হ্যায়।' বুড়াবাবু? না রে, বাবু বুড়ো নয়। জোয়ান। 'নহি নহি, উনকা নাম হ্যায় বুড়োবাবু। কলভি উনকে সাথ ভেট হুয়া থা বজারমে।' চলো ভাই গাঙ্গুটিয়া। বাঁ দিকে ছোট্ট রেল স্টেশন কালচিনি, চা-বাগান, ডান দিকে ডিমা। সরু

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

পিচ-ঢালা পথ। রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল রেললাইন। দু'পাশের দৃশ্যাবলি দেখতে দেখতে যাওয়া। অনেকটা যাওয়ার পর বিচলাইন। কিছু ঘরবাড়ি, দোকান-পসার। সোজা রেললাইন টপকে গেলে চা-বাগানের কাঁচা সড়ক। সোজা পথটি আটিয়াবাড়ি ভাতখাওয়া স্টেশন, চা-বাগান ডিমা নদী হয়ে রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গল।

দিগন্তপ্রসারিত সবুজ সোনার দেশ। শেড ট্রি-র ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে নীলাভ ভুটান পাহাড়। নুড়িপাথর, বালিমাটির রাস্তা বেয়ে পৌঁছে গেলাম গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান। ডান দিকে চা-বাগানের কোয়ার্টার, অফিস, কুলিকামিনরা পাতা তুলছে। ঠিক পৌঁছে গেলাম সনৎদার কোয়ার্টারে। এহি হ্যায় বুড়াবাবুকা কোয়ার্টার। তিরিশ/চল্লিশ বছর আগে কালচিনির বাতলা থেকে গাঙ্গুটিয়া কত ছিল রিকশা ভাড়া? দশ না বিশ? আজ মনে পড়ে না। বারান্দায় ছেলেমেয়েরা, বোন দাঁড়ানো। ভিতর থেকে সনৎদার ভরাট গলা, 'গৌরী, চলে এসো।' কাউকে চিনি না। সনৎদাকেও প্রথম দেখা। বললেন, 'নিজের মনে করে এসেছ। যতদিন ইচ্ছে থাকো। অতিথি আপ্যায়নে ক্রটি হলে মার্জনা। উমা, গৌরী এসেছে, চা করো।' ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরে কোথায় কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে সেইসব কথাবার্তা চলছে। 'গৌরী, আমি তোমাকে এদের মাঝে রেখে যাব চা-বাগানের অফিসে। চা-বাগানের খুবই খারাপ অবস্থা। দু'জনে একসঙ্গে খাব। আর যদি দেরি হয় তো খেয়ে নিয়ো। সন্ধ্যায় গান-কবিতার আসর বসবে।'

কবি-লেখকদের বাড়িতে যা-ই থাকুক, কমবেশি পুঁথিপুস্তকের সম্ভার থাকেই। নিদেনপক্ষে গাদাগুচ্ছের লিটল ম্যাগাজিন। সনৎদার পড়ার ঘরটি চমৎকার। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর, চা-বাগান, নীল পাহাড়ের হাতছানি। অনাবিল শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ। সে বড় সুখের দিন ছিল। ভাবনাচিন্তা কম। খাওদাও, ঘোরো-ফেরো। হারমোনিয়াম কোলের কাছে নিয়ে কত গান যে শুনিয়েছিলেন, আজ আর মনে পড়ে না। সাদরি থেকে রবীন্দ্রসংগীত। যে ক'দিন ছিলাম, সনৎদার ছেলেমেয়েরাই ছিল চা-বাগানে। বেড়ানোর ভ্রমণসাথি, পথপ্রদর্শক। বেশ মজা করে ঘুরে বেড়াতাম। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। শিয়ালের হুক্কাহুয়া আর পেটা ঘড়িতে ঢংঢং শব্দ। সকালবেলায় একাকী নরম সবুজ মাঠে পায়চারি। ঝুমি বলত, 'কাকু, কী করো?' বিকেলবেলায় গাঙ্গুটিয়ার গল্প শোনাতেন সনৎদা। কত গাংশালিক, টিয়া, ময়না, বুলবুলি, কোয়েল, বেনেবউ, নীলকণ্ঠ পাখির সাম্রাজ্য ছিল গাঙ্গুটিয়া, চিঞ্চুলা, রাইমাটাং, ডিমা, কালচিনি। অল্প ক'দিন পর সকালবেলায় গাঙ্গুটিয়া থেকে স্মৃতির ঝোলা বহন করে আলিপুরদুয়ার ফিরে আসি। কবেকার স্মৃতিকথন। আজও জ্বলজ্বল করে। এ জলছবি যতদিন বেঁচে থাকব, মোছার নয়।

গাঙ্গুটিয়ার গল্প শেষ হবার নয়। চেনা পথে বহুবার আসা-যাওয়া। ঘোর বর্ষায়, ঝড়বাদলে, বসন্তে শিমুলের তুলো ওড়ে, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, অমলতাস, ম্যাকারান্ডা, বন্য টগর, সন্ধ্যামালতী ফুলের জলসায় অভিনব ডুয়ার্স। দুঃসময়-সুসময়ে সনৎদার সান্নিধ্য পেতে চলে এসেছি। গাঙ্গুটিয়া নিয়ে সনৎদার ভালবাসা, দুর্বলতার শেষ নাই। সত্যি এক মজার দেশ। সাধে কি শক্তি চাটুজ্জে লিখেছেন—
'অনেক দেশে গেছি কিন্তু গাঙ্গুটিয়ায় যাইনি
অনেক খাবার খেছি কিন্তু
গাঙ শালিকটি খাইনি।'

কল্পনার চোখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখতে পান, গাঙ্গুটিয়ায় এখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। শিরীষ গাছের নিচে সদেশিয়া মেয়ে-বউরা অমৃতরস বিক্রি করছে। আমি লিখেছিলাম, গাঙ্গুটিয়া সবুজ সোনার দেশ। আর বুড়োদার সঙ্গে বেড়ানো। গাঙ্গুটিয়ার প্রশস্তি নিয়ে খ্যাত-অখ্যাত কবি-লেখকদের ভালবাসা উজাড় হয়ে পড়েছে, তার মূলে সনৎদা। চা-বাগানে থেকে শত প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সনৎদা প্রায় ছ'-সাত বছর 'উন্মেষ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বাগানে বাগানে ঘুরে হ্যামিলটনগঞ্জ, কালচিনি, জয়গাঁ, হাসিমারা, আলিপুরদুয়ার একা ঘুরেছেন 'উন্মেষ'-এর জন্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। প্রায়শই চিঠি লিখতেন— 'গৌরী, 'উন্মেষ'কে বাঁচা। বিজ্ঞাপন, চাঁদার ব্যবস্থা কর।' মাঝে মাঝে ভীষণ হতাশা জাগত। 'কিছুই করতে পারলাম না রে গৌরী। ভাল একটা কাব্যগ্রন্থ। আমারই সহপাঠী শীর্ষেন্দুর কত নামডাক।' 'বাস স্টপে কেউ নাই' বইটা আমাকে উৎসর্গ করে। এই বাগানের ছেলে বিপুল গুহ 'আনন্দবাজার'-এর আর্ট ডিরেক্টর। বলে, 'বুড়োদা, তোমার কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ আমি এঁকে দেব। তিলোত্তমাকে চিনিস। এই চা-বাগানের মেয়ে। অনেক নাম, যশ, খ্যাতি। আমি যে তিমিরে, সে তিমিরে। কেউ মনে রাখে না। গৌরী, কিছু মনে করিস না। দুঃখে-আবেগে বলে ফেলি।' সনৎদা এখন অন্ধ, বধির। বড় নিঃসঙ্গ। স্তব্ধ কলম। নির্জন বারান্দায় চেয়ারে বসা বউদি বলেন, 'গৌরীবাবু, হারাধনবাবু এসেছে।' গায়ে হাত রাখে। হারু, এতকাল পরে মনে পড়ল! দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সের পিঠেপুলি

ডিসেম্বরের এক সকালে জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক ফোন করেছিলেন। জলপাইগুড়িতে থাকলে তাঁর সঙ্গে যেন পত্রপাঠ দেখা করি। জরুরি তলব পেয়ে তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখি, দু'জন আধিকারিক আছেন সেখানে। আছেন অনুষ্ঠান সঞ্চালনাতে ডুয়ার্সে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই ব্যারিটোন কণ্ঠস্বরের মালিক মানস ভৌমিকও। মহকুমাশাসক প্রথমে আমাদের চা খাওয়ালেন, তারপর স্মিতমুখে জানালেন, ইংরেজি বর্ষশেষের শেষ লগ্নটুকুকে স্মরণীয় করে রাখতে ও নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগত জানাতে বছরের শেষ দিন সন্ধেবেলা একটা অনাড়ম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভাবনা মাথায় এসেছে ওঁর।

আমরা বিশদে জানতে চাওয়ায় তিনি জানালেন, জলপাইগুড়ির সৌন্দর্যরেখা করলা নদীর পাড়ে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মাঠ তিনি বেছে রেখেছেন। সেখানে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চলবে আসর। পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আখড়া থাকবে সমদূরত্বে রেখে। সেখানে একই সঙ্গে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কবিগান, মূকাভিনয়, ধ্রুপদী নৃত্য ও লোকনাচ, আঞ্চলিক যন্ত্রসংগীত ও কবিতাপাঠ এবং ব্যান্ডের গান। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি পিঠেপুলি ও অন্যান্য জিবে জল আনা খাবারদাবার থাকবে রসনা তৃপ্ত করার জন্য। একেবারে শেষে থাকবে রংবেরঙের বাজি পোড়ানো ও ফানুস। আমরা যেন আমাদের মতামত দিই এবং সাধ্যমতো তাঁকে সাহায্য করি, যাতে অনুষ্ঠানটি সফল হয়।

মহকুমাশাসকের ভাবনাটি যে অভিনব, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সাধারণ মানুষ টিভির বিনোদন চ্যানেল ছেড়ে এই অনুষ্ঠান দেখতে আসবেন কি না, সেটা নিয়ে আমাদের সকলের উদ্‌বেগ ছিল। সে জন্য মানুষের অবগতির জন্য খবরের কাগজে লিফলেট দেওয়া হল। পোস্ট করা হল সোশ্যাল নেটওয়ার্কে।

ডিসেম্বরের শেষ দিন বিকেলবেলা আমরা সকলে পৌঁছে গিয়েছিলাম নির্দিষ্ট স্থানে। বিকেল চারটের সময় শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। একসঙ্গে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আখড়ায় পাঁচরকম অনুষ্ঠান। যে দর্শকের যেমন রুচি, তিনি ভিড় করবেন তাঁর পছন্দের আখড়ায়। লক্ষ করলাম, একজন-দু'জন করে কৌতূহলী দর্শক ভিড় জমাতে শুরু করলেন। দর্শকদের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েকজন উঠে এলেন স্টেজে কবিতা পড়ার জন্য। গান গাইলেন কেউ কেউ। অল্পবয়সিদের দল গোল করে হাতে হাত ধরে নাচ করতে শুরু করে পাঁচটি আখড়া ঘিরে ঘিরে।

সন্ধে গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জনারণ্যে বদলে গেল ভিড়টা। নাচের তালে তালে দুলতে শুরু করলেন প্রায় প্রত্যেকে। দর্শক ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন, এমন অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান চাক্ষুষ করার সুযোগ খুব বেশি আসবে না এই স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবনে। সব শেষে পোড়ানো হল চমকপ্রদ বাজি। ওড়ানো হল একশো ফানুস। তমিস্র আকাশ বর্ণিল হল রংবেরঙের ফানুসে। আনন্দোৎসব শেষ হবার পরও তার রেশ থেকে গেল সকলের মনে। ভালবাসার দাগ রেখে গেল অন্তরের অন্তঃস্থলে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পিঠেপুলি খেতে খেতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলাম বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। আটের দশকের শুরুতে, আমরা যখন স্কুলছাত্র, তখন দেখেছি, মধ্যবিত্ত বাড়ি থেকে পিঠেপুলি বানাবার চলটা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। তখন বাড়িতে ভ্যানিলা ফ্লেভার দেওয়া কেক আর পুডিং বানানোটাই ছিল 'ইন থিং'। স্কুলের কোনও কোনও বড়লোক বাড়ির ট্যাঁশ বন্ধু কেক নিয়ে আসত টিফিনে। আমরা জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতাম আর ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। তবে চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি দুখানি চ-এর মতো পুরনো ঢং, পুরনো রং, পুরনো ফ্যাশন, পুরনো খাবারদাবার নতুন হয়ে ফেরে। মেয়েদের জামার হাতা যেমন। চলতি ফ্যাশনে হাতা নেই। কাঁধ পর্যন্ত। আস্তে আস্তে বাড়বে, কবজি ছুঁয়ে ফেলবে, তারপর আবার একসময় ফিরে যাবে কাঁধে। পিঠেপুলিও ঠিক তা-ই। বছর দশেক ধরে দেখছি, আবার পিঠেপুলির চল ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে এসেছে বললে ভুল বলা হবে, বলতে হবে ধুম লেগেছে পিঠেপুলির। শীতকালে বইমেলায় তো বটেই, নানারকম আঞ্চলিক উৎসবেও প্রচুর পিঠেপুলি বিক্রি হচ্ছে। নামজাদা মিষ্টির দোকানের শোকেসে সাজানো থাকছে পাটিসাপটা। পৌষসংক্রান্তির সময় তার বিক্রি সবচাইতে বেশি।

পিঠে বানাবার মূল উপকরণ হল চালের গুঁড়ো, নারকেল ও খেজুর গুড়। শীতকালে এই তিনটে উপকরণ একসঙ্গে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পিঠেতে গুড় ব্যবহার করা হয়। ঠাকুমাদের প্রজন্মকে দেখেছি ময়দা দিয়ে সরু সরু চসি বানাতে। চসি পিঠে ছাড়াও আর একটা ঝোল ঝোল পিঠে হত। সুজি পিঠে।

সুজির সঙ্গে নারকেল কোরা, এলাচ দানা মিশিয়ে, চিনির সঙ্গে পাক দিয়ে গুলি তৈরি করে ঘন দুধে সামান্য কিছুক্ষণ ফোটানো হয়। আর-একটা পিঠে হল চিতই পিঠে। মাটি দিয়ে ইঞ্চিখানেক মোটা চাটু তৈরি করে মাঝে মাঝে কয়েকটা খোঁদল করে মাটিতে শুকিয়ে নেওয়া হত। শীত আসার আগে এটা বানাতে হত। এবার এই মাটির চাটু উনুনে বসিয়ে খোঁদলগুলিতে চাল বাটার গোলা কিংবা চালের গুঁড়োর পেস্ট হাতা দিয়ে ঢেলে দেওয়া হত। সেই খোঁদলে সাদা সাদা ফুল ফুটে উঠত। ফুলেফেঁপে যেত সেই চালের পেস্ট।

কোনও কোনও বাজারে বা গ্রাম্য হাটে পোড়ামাটির তৈরি চিতই পিঠের গর্তময় চাটু তথা ছাঁচ বিক্রি হতে দেখা যায়। এতে কতটা সুস্বাদু পিঠে হয় বলা মুশকিল। তবে এর তুলনায় পাটিসাপটা তৈরি করা সহজ। তাই মেলা-টেলায় পাটিসাপটা হামেশাই দেখা যায়। আতপ চাল ভিজিয়ে বেটে ঘন করে গুলে অমলেটের মতো চাটুতে ছড়িয়ে

ভিতরে পুর দিয়ে গুটিয়ে নিতে হয়। ননস্টিক তাওয়া আসায় এই প্রক্রিয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। তবে পুরটাই আসল। নারকেল কোরা, খেজুর গুড়, এলাচ দানা কষিয়ে মণ্ড বানাতে হয়। খোয়া ক্ষীর দিলে তো অতি উত্তম। সন্দেশও দেন অনেকে। পাটিসাপটা পরিপাটি করে বানাতে পারলে খাসা লাগে খেতে। বিশেষত গরম গরম।

পুলিপিঠে নানারকম হয়। সেদ্ধ, ভাপা, ভাজা। মিহি চালের গুঁড়ো গরম জলে ময়দার মতো মেখে নিতে হয়। নারকেল কোরা, গুড়, এলাচ দিয়ে পুর তৈরি করা হয়। চালের মণ্ডর লেচির ভিতর পুর ঢুকিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। দেখতে অর্ধচন্দ্রের মতো, তবে পেট ফোলা। এবার ফুটন্ত জলে কিছুক্ষণ রেখে উঠিয়ে নিলে সেদ্ধ পুলি। ফুটন্ত জলের হাঁড়ির উপর একটা কাপড় দিয়ে জলের বাষ্প কাপড় ভেদ করে উঠবে। তার উপর পুলিগুলি রেখে ঢাকা দিলে ভাপা পুলি, ঘিয়ে ভাজলে ভাজা পুলি, আবার এইসব পুলিগুলো ঘন দুধেও ফোটানো যায়। পিঠে গোত্রের মধ্যে রয়েছে গোকুল পিঠে। ক্ষীরের লেচির মধ্যে গুড়-নারকেলের পুর দিয়ে, দুধ-ময়দার গোলায় ডুবিয়ে, ঘিয়ে ভেজে, চিনির রসে ডুবিয়ে এই খানদানি পিঠে তৈরি হয়। ছোটবেলায় বুঝতাম না, এখন বিলিতি লোকজনের জন্য দুঃখ হয়। সেখানে ধান হয় না, নারকেল নেই, তাই পিঠেপুলির অমৃত আস্বাদ চাখার উপায়ও নেই। কেক খেয়েই বিলিতি লোকজনকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

বিলাতের কথা ওঠায় বিলিতি গ্লাস-ডোম ট্রেনের কথা মনে এল। কেউ কেউ বলেন সানরুফ এক্সপ্রেস। উইন্ডো সিট নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই। কেননা সে ট্রেনে সে অর্থে কোনও জানলা নেই। ছাদে বা দু'পাশে পুরোটাই জানলা। ডাইনে-বাঁয়ে চোখ ফেরালে বা ছাদ দিয়ে তাকালে ধরা দেবে প্রকৃতির শোভা। মেঝে বাদে গোটা কামরা, এমনকি ছাদও কাচের। আলাস্কায় এই ট্রেনে সফর পর্যটকদের কাছে এক আলাদা আকর্ষণ। সে দিন কাগজে পড়লাম, পশ্চিমবঙ্গে এক বছরের মধ্যেই এই ধরনের ট্রেন পর্যটকদের উপহার দিতে চায় রেল। ভরপুর নিসর্গের ডুয়ার্স আর রাঢ় বাংলার জঙ্গলমহল চিরে যাওয়া লাইনে ওই ট্রেন চালানোই তাদের লক্ষ্য। কাচের কামরায় বসে পাহাড়, নদী, জঙ্গল, ঝরনা, চা-বাগানের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পর্যটকরা ভিড় জমাবেন বলে আশা করছে রেল। একটা সাধারণ ট্রেনের সঙ্গে দু'টি কাচের কামরা জুড়ে দেওয়া হবে প্রথমে। সফরে দামি রেস্তরাঁর খাবার একাধিকবার পাবেন যাত্রীরা। থাকবে নরম পানীয়, ফলের রস, মকটেল। ভবিষ্যতে বিয়ার, ওয়াইনের মতো মদিরাও যাত্রীদের দিতে চায় রেল।

আপাতত এই ধরনের দু'টি বিশেষ কামরার জন্য রেলমন্ত্রকের কাছে আবেদন জমা দিয়েছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড টুরিজম কর্পোরেশন বা আইআরসিটিসি। তারা মনে করে, পর্যটকদের কাছে ডুয়ার্স চিরে যাওয়া প্রাকৃতিক শোভা ও হাতির করিডর অত্যন্ত আকর্ষক। তবে দিনের আলো ছাড়া প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করা যাবে না। তাই এক প্রান্তের স্টেশন থেকে ছেড়ে অন্য প্রান্তিক স্টেশনে ট্রেনটি যাতে দিনে দিনেই পৌঁছে যেতে পারে, সেটা মাথায় রেখে ট্রেন বাছতে হবে। রাজধানী বা শতাব্দীর মতো দ্রুতগতির ট্রেন নয়, এমন ট্রেন বাছতে হবে, যার গতি কম।

সাতসকালে পেডং থেকে গাড়ি নিয়ে লাভা যাচ্ছিলেন আনমোল ছেত্রী। সবে হালকা হতে শুরু করেছে জমাট বেঁধে থাকা কুয়াশা। বনপাহাড়ি রাস্তা ফুঁড়ে এ সময় বনমোরগ আর নাম-না-জানা পাখিদের হুটোপুটি। মধ্যেই চোখ চলে গেল দূরের পাথরটার দিকে। ডোরাকাটা ওটা কী! নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে কিছু একটা। সুন্দরবনে তার রাজকীয় চালচলন নিত্য দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু উত্তরে? খাতায়-কলমে বক্সা এখনও টাইগার রিজার্ভ বা বাঘবন। বছর দুয়েক আগে বাঘশুমারিতে সেখানে খান তিনেক বাঘের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু গত দু'দশকে তার দেখা মেলেনি। আনমোল পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে ছবি তুলে নিয়েছিলেন খানকয়েক। সেই ছবি দেখে আপ্লুত বনকর্তারা। পরদিনই লাভা-পেডং রোডে পাঠানো হয়েছিল বনকর্মীদের। বাঘের সদ্য করা শিকারের অবশিষ্টাংশ মিললেও দেখা পাওয়া যায়নি।

৮৮ বর্গকিলোমিটার নেওড়া ভ্যালিতে অফিশিয়ালি বাস করে রেড পান্ডা, মেঘলা চিতা বাঘ, কস্তুরী হরিণ, চিতাবাঘ, ভালুক, শম্বর, উড়ুক্কু কাঠবিড়ালি, শঙ্খচূড়, নানা প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতি। তবে গত চল্লিশ বছরে অন্তত নেওড়া ভ্যালিতে বাঘের দেখা মেলেনি। কিন্তু আনমোল ছেত্রীর ছবি দেখে মনে হচ্ছে, কালিম্পং পাহাড়ের ৭ থেকে ১০ হাজার ফুট উচ্চতা এখন রয়্যাল বেঙ্গলের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে। ছবিটা অবশ্য এমন ছিল না। পঁচিশ বছর আগেও বক্সা তো বটেই, গোরুমারা কিংবা জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের লাগোয়া গ্রামগুলোতে বাঘের পা পড়ত নিয়মিত। বক্সার বাঘেরা নিয়মিত ভুটান পাহাড়ের দিকে উঠে যাওয়ায় তাদের সহজে দেখা মেলে না। তবে নেওড়া অভয়ারণ্যের বেশ কিছু জায়গা এখনও ভার্জিন। বনবাংলোর উপচানো ভিড় বা ফ্ল্যাশ বাল্‌বের ঝলকানি বাঘের না-পসন্দ। কুমায়ুনের পিথোরগড়ে ১৩,০০০ ফুট উচ্চতায় কয়েক মাস আগেই বাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। নেওড়ায় বাঘের দেখা পাওয়ায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

খবরটা পড়ার পর মনটা ভাল হয়ে গেল। নেওড়া উপত্যকায় বাঘের দেখা মিলেছে, বক্সা, জলদাপাড়া বা গোরুমারার জঙ্গলেও নিশ্চয়ই বাঘের দেখা পাওয়া যাবে আগের মতো। বছর পঁচিশেক আগেও যেমন যেত। অদূর ভবিষ্যতে আপাদমস্তক কাচে মোড়া ট্রেনে যেসব পর্যটক ডুয়ার্সের জঙ্গল এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করবেন, তাঁরা যে একটু বাড়তি কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাইরের সবুজের দিকে দৃষ্টি রাখবেন, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে সাকিন

আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার সাফল্যের ইতিহাসে নবতম সংযোজন আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ। গত ১৯ জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের টালিগঞ্জ-রানিকুঠির আঙ্গিক আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে তিমিরবরণ রায় রচিত, মিন্টু দত্ত নির্দেশিত নাটক 'সাকিন' উপস্থাপিত হয়। দুই বাংলার সম্প্রীতি ও সেতুবন্ধন উঠে এসেছে দুই বাংলার দুই লোকশিল্পীর করুণ কাহিনির মধ্যে দিয়ে। 'সাকিন' নাটকে দৃশ্যমান হয় নারী পাচার, দুই দেশের সীমান্তপারের দুই কর্তব্যরত অফিসারের টানাপোড়েন এবং সমাজের এক প্রতিবাদী ডাক্তারের কাহিনি।

আঙ্গিকের নাট্য উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ড. হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় (সচিব, রাজ্য নাট্য আকাদেমি), অরুণ মুখোপাধ্যায় (অভিনেতা ও পরিচালক, চেতনা), রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (নাট্য সমালোচক), শৈলেন সাহা (নাট্য

সংগঠক, দিল্লি) এবং পূর্ণেন্দু ধর (নির্দেশক, ভূমিসৃত থিয়েটার)। 'সাকিন' নাটকটি দেখার পর উপস্থিত সকলেই প্রশংসা করেন। সংস্থার সকল কুশীলবের কাছে একটা বাড়তি পাওনা হল শৈলেন সাহার উদ্যোগে দিল্লি অভিমুখে নাটক করতে যাওয়ার প্রস্তাব। অপর দিকে গত ২১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার গাজলে 'বিষাণ' (একটি নাটকের দল)-এর আমন্ত্রণে 'সাকিন' নাটকটি সমাদৃত হয়। এখানেও গাজলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নাটকটি দেখেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। নাটকে অভিনয় করেন পরিতোষ সাহা, তনুশ্রী সাহা, গৌতম দত্ত, শাশ্বতী দত্ত, মিন্টু দত্ত, রিজু সাহা, জয় মোহন্ত, দেবাশিস সরকার, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় এবং নিবারণ রায়। আবহ সমিত সেন ও বিরাজ বণিক, নেপথ্য কণ্ঠ শুভ সাহা, আলো সুজিত সাহা, রূপসজ্জা জৌতি সরকার, মঞ্চ পরিকল্পনা তনয় সাহা এবং সামগ্রিক সম্পাদনা মিন্টু দত্ত।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ফোটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব কোচবিহার-এর উদ্যোগে কিছুদিন আগে সমাপ্ত হল 'পঞ্চম আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী'। কোচবিহারের সাগরদিঘির পাশে মুক্ত মঞ্চে তিন দিনের এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, চিন, কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, বেলজিয়ামসহ ৩৭টি দেশের মোট ২১৪ জন আলোকচিত্রী এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। আলোকচিত্রগুলিকে সাদা-কালো, রঙিন, নেচার-সহ মোট ৫টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পুরস্কার ছিল ৯০টি। দেশ-বিদেশ থেকে আসা আলোকচিত্রীদের তোলা ২৪৯৪টি আলোকচিত্রর মধ্যে বাছাইকরা ৭৪৮টি ডিজিটাল আলোকচিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়। কোচবিহারে এই প্রদর্শনী দেখতে উৎসুক দর্শকের আগ্রহ ছিল দেখার মতো।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নাট্যসন্ধ্যা

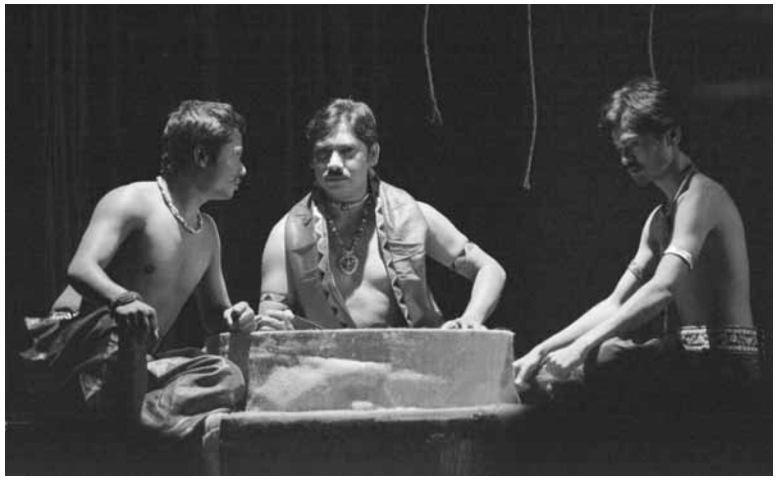

নতুন বছরের শুরুতেই নাট্যপ্রেমী দর্শকদের একটি সুন্দর নাট্যসন্ধ্যা উপহার দিল কোচবিহার আনন্দম কালচারাল সেন্টার। একই দিনে তিনটি নাটক পরিবেশন করল তাদের সদস্যরা। স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে তাদের ৩৬তম বর্ষপূর্তি নাট্যসন্ধ্যার প্রথম নিবেদন ছিল 'পারসব'। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাটকের নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশক শঙ্কর দত্তগুপ্ত। এর পর ছিল পুতুলনাটক 'এক বছরের রাজা'। একঝাঁক কচিকাঁচা মিলে দ্বিতীয় নিবেদন 'বুদ্ধিজীবী'। তৃতীয় ও শেষ নিবেদন ছিল উৎপল দত্ত অনূদিত শেকসপিয়রের নাটক 'লেডি ম্যাকবেথ', যা দর্শকদের মোহিত করেছে। নাট্য সম্পাদনা ও নির্দেশনা সুদীপ মুখোপাধ্যায়। নামভূমিকায় সুকন্যা দত্তগুপ্তর অভিনয়ও প্রশংসার দাবি রাখে। এ দিন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের হাত দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীদের। নীরজ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার পান বিদ্যুৎ পাল। ষষ্ঠী ভৌমিক স্মৃতি পুরস্কার পান বিনায়কব্রত বর্মন। জ্যোতি পাল ও দীপা বর্মন পান মানস দে স্মৃতি পুরস্কার এবং সমাজসেবার জন্য কোচবিহার ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন পায় সুশীলাবালা স্মৃতি পুরস্কার।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মালবাজারে এসে ডুয়ার্সের গন্ধ মাখলেন শিল্পী তৃষিত চৌধুরী

সংগীত শিল্পী তৃষিত চৌধুরী বারবার ডুয়ার্সে ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র এই চা-বাগান আর পাহাড়ের টানে। এইবার মালবাজারের অঙ্কুর শিশু-বিদ্যামন্দিরের রজত জয়ন্তী বর্ষের এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন। এই নিয়ে কয়েকবার এসেছেন ডুয়ার্সে। ব্যস্ত শহর কলকাতা ছেড়ে শুধু প্রকৃতির মাঝে আসেন নিজেকে একটু একান্ত করে পাবেন বলে।

জন্ম কলকাতায়। বড় হয়েছেন সুরের মাঝেই। প্রথম শিক্ষা গুরু বাবা অমিত কুমার চৌধুরীর কাছে। রবীন্দ্রভারতী থেকে রবীন্দ্রসংগীতে এমএ করেছেন ও স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। এখন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও তিনি নানা রকমের বাংলা গান গেয়ে থাকেন। মাল শহরের বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের মাঝে এই ধরনের বাংলা গানের অনুষ্ঠান সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। তিনি বললেন, বর্তমানে মানুষ সিরিয়ালমুখী ও রিয়ালিটি শো-এর ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় মালবাজারে বাংলা গানের শ্রোতা এত রাতেও ঠান্ডার মধ্যে বসে গান শুনলেন তা দেখতেও ভাল লাগে। তিনি আরও বললেন, বর্তমান প্রজন্মের ধৈর্যের অভাব, সহজেই শিল্পী হতে চায়, সাধনা করে যা পেতে হয় তা কি এত অল্পে পাওয়া সম্ভব! তবুও তিনি আশাবাদী। বর্তমানে প্রচুর নবীন শিল্পী ভাল গান গাইছে। আবার আসার ইচ্ছে নিয়ে পাহাড়, চা-বাগিচা আর ঝরনা ঘেরা শহর মালবাজার থেকে রওনা দিলেন কলকাতার দিকে, নিজের ব্যস্ত জীবনের অভ্যাসে।

মীনাক্ষী ঘোষ

'প্রোজেক্ট হেরম্বপুর' বার্তা দিতে ব্যর্থ

অগ্রগতির পথ বেয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠছে তা আজ গভীর সঙ্কটে। ইট-কাঠ-পাথরে ঢাকা শ্বাসরোধ করার এই সময় মানুষকে হাফ ছেড়ে বাঁচার জন্য প্রকল্প তৈরি করছেন ত্রিনয়নী চাকলাদার। মূলত পরিবেশ রক্ষা নিয়ে সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন নাটক 'প্রোজেক্ট হেরম্বপুর'। সময়ের অন্তরভেদী কোলাহলে বাংলা নাটক যখন নিজেই বিভ্রান্ত— তখন অত্যন্ত সময় উপযোগী ও প্রাণীকূলকে বাঁচাবার তাগিদ নিয়েই এই রচনা হলেও নাটকের বার্তা দর্শকের কাছে পৌঁছল কই? অত্যন্ত সিরিয়াস একটি নাটককে সহজ করে পৌঁছে দিতে গিয়ে হাসির নাটকে পরিণত করে ফেলেছেন নির্দেশক অশোক ব্রহ্ম। তবে তার এই চেষ্টার কারণেই দর্শক নাটকটি উপভোগ করতে পেরেছেন। অনুভব গত ১২ জানুয়ারি তাদের উৎসব অঙ্গন কোচবিহার রবীন্দ্রভবন মঞ্চে প্রযোজনা করল প্রোজেক্ট হেরম্বপুর। অনবদ্য মঞ্চভাবনা— মঞ্চ খুলতেই যা দৃশ্যায়ন হল তাকে বাহবা দিতেই হবে। মহার্ঘ রায়, নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ও সুমিত দে-র মঞ্চ নির্মাণ তাক করে দেবার মতোই। অনুরাগ সরকার ও সুনীল দাসের আবহ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হলেও পঙ্কজ মৈত্রের আলোক প্রক্ষেপণ ত্রুটিপূর্ণই মনে হয়েছে। গোটা নাটকটাই অনেক দরদ দিয়ে নির্মাণের চেষ্টা হলেও নাটকের গল্পটাই যে সেভাবে গুছিয়ে শেষ হল না। অনেক কথা বলতে গিয়ে ত্রিনয়নী বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রীপর্ণা ব্রহ্ম এখন প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী, তিনিও কিন্তু তার অভিনয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট তানিয়া চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী, আড়ষ্টতা কিছু থাকলেও মোটের ওপর চলনসই। সিকিউরিটি বয় দিগম্বর দিকপতি চরিত্র অনুযায়ী অভিজিৎ ভট্টাচার্য করার চেষ্টা করলেও এত অবাঞ্ছিত কথা ও প্রায় সর্বক্ষণ মঞ্চে থেকে কখনও কখনও দিকভ্রান্ত হয়েছেন।

ছদ্মবেশী কাকার চরিত্রে সৌরভ ভট্টাচার্য টানটান করে রাখলেও তার অতি নাটকিয়তা ছন্দপতন ঘটেছে বেশ কয়েকবার। বেশ ভাল

লাগার মতো অভিনয় করেছেন সরকার চরিত্রে মহার্ঘ রায়। বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ত্রীকে ফোন করার সময় দারুণভাবে উপভোগ করা গেছে। যথাযথ অভিনয় রুস্তম চরিত্রে অনুরাগ সরকার। দীর্ঘ কয়েক বছর পর মঞ্চে অভিনয় করলেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। তার কাছ থেকে কোনও ফাস্ট বয়ের অঙ্কে একশো পাবার আশা থাকলেও হল কই? তবে দর্শকদের মাত করে দিলেও নিজের অভিনয় না থাকার সময় নাটকীয় চরিত্রে পোদ্দারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। না বলা কথার অভিনয় কোথায়? তবে এই নাট্য সন্ধ্যায় গোটা নাটকে মজা দিয়ে গেছেন তিনিই। পরিশেষে নির্দেশক অশোক ব্রহ্ম যেভাবে নাটকের প্রথম

প্রযোজনায় ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বললেন তা কোনওভাবেই মানা যায় না। একটি থিয়েটার গ্রুপের কাছে প্রথম প্রযোজনা ও একশোতম প্রযোজনার মধ্যে কোনও তফাৎ থাকা উচিত নয়। সৈনিকরা যথেষ্ট লড়াই করলেও কমান্ডার তুষ্ট নয় বলেই মনে হয়েছে অন্তত তার স্বীকারোক্তিতে। তবে অনুভব প্রযোজনা 'প্রোজেক্ট হেরম্বপুর' যথেষ্ট ভাল নাট্য হিসেবেই পরিবেশিত হয়েছে সেদিনের সন্ধ্যায়। নির্দেশকদ্বয় অভিজিৎ ভট্টাচার্য ও অশোক ব্রহ্মের কাছে একটি প্রস্তাব ভেবে দেখতে অনুরোধ রাখব ত্রিনয়নী যেমন ছয়টি আঙুলের একটি অ্যামপুট করেছিল, ক্লান্তজি লাগছে দেখে জানালার একটি নকশা বাদ দিয়ে দিয়েছিল। কমপ্যাক্ট-টাইট নাটক হিসেবে কিছুটা সম্পাদনা করার, তাহলেই বোধহয় এই নাট্য নির্মাণ যথেষ্ট সাফল্য পাবে।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

নাট্য প্রতিযোগিতায় সামিল জলপাইগুড়ির উদীচী

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর গোটা জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে 'অল ইন্ডিয়া প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল লেন্থ বেঙ্গলি ড্রামা কম্পিটিশন'-এ অংশগ্রহণ ও দুর্ধর্ষ অভিজ্ঞতা পুঁজি করে ফিরে এল 'উদীচী নাট্য সংস্থা'। বিগত ২০ বছর ধরে এই নাট্যদলটি জলশহরের বুকে পূর্ণাঙ্গ নাটকের চর্চা করে চলেছে এবং এই নিয়ে অষ্টমবার লখনউ বেঙ্গলি ক্লাব ও যুব সংস্থার আয়োজনে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় যোগদান গোটা জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে আসা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। উত্তরবঙ্গ থেকে জলপাইগুড়ি ছাড়া অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট এবং জাগরণী থিয়েটার গ্রুপ রায়গঞ্জ।

'উদীচী' যে নাটকটি নিয়ে লখনউ রওনা হয়েছিল তার নাম 'ত্রিংশ শতাব্দী', রচনা বাদল সরকার, পরিচালনায় অভিজিৎ নাগ। এই জার্নিতে সর্বসাকুল্যে ছিলেন ২৮ জন। নাটকের কাহিনি জাপানে গত মহাযুদ্ধে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ওপর। সেই বিকৃত বিকলাঙ্গ মানুষেরা বিংশ-শতাব্দীর কুৎসিত বিষে জর্জরিত। যদি আজ থেকে হাজার বছর পর ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষেরা জবাব চায় কী এই আত্মঘাতী বিকৃত-বুদ্ধি মানুষের বিস্ফোরণের হেতু? বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা কি অভিযুক্ত? যদি এর বিচার হয়? ত্রিংশ শতাব্দীর মানুষেরা যদি জবাব চায়? একজন উন্মাদ বাংলার অধ্যাপক এইসব চিন্তা করতে করতে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি প্ল্যানচেটে ডেকে আনলেন সেইসব মানুষদের, যারা পরমাণু বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত। সেইসব মানুষ যারা বিধ্বস্ত সে বোমায়। বোমা যিনি ফেলেছিলেন সেই টমাস উইলসন ফেরেবি থেকে পরমাণু বোমার ফর্মুলা আবিষ্কর্তা আইনস্টাইন অবধি ত্রিংশ শতাব্দীর কাঠগোড়ায়। সম্পূর্ণ দু' ঘণ্টার এই নাটক দেখলে মনে হবে আপনি কোনও থিসিস পেপার পড়ছেন। নাটকের শুরুতেই বলা হয়েছে 'এ নাটক সুন্দর নয়'। তবুও এই থিসিস পেপারকেই নাটকীয়ভাবে

পরিবেশন এবং এর সঙ্গে আছে বাদল সরকারের অনবদ্য কৃতিত্ব রস্টামের ওপর থার্ডফর্ম।

৫৩তম জাতীয় নাটক প্রতিযোগিতায় উদীচী মুগ্ধ করে ফিরেছে লখনৌবাসীর নাট্যমোদী মন। তার জন্য অবশ্যই পরিচালকসহ বাদবাকি কুশীলবদেরও ধন্যবাদ প্রাপ্য— অনিন্দ্য ভৌমিক, দীপংকর রায়, ডালিয়া চৌধুরী, শুভেন্দু চক্রবর্তী, সঞ্জয় ঘোষসহ অনেকেই। এছাড়া থার্ডফর্মে অনিকেত, রিজু, রঙ্গন, শুভম, সুমনা প্রত্যেকেই নিজেদের ১০০ শতাংশ ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। আবহ দিয়েছেন নীলাব্জ এবং প্রক্ষেপণে দীপংকর কর্মকার। আর একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে, নাটকে, সেটি হল, প্রজেকশনের কাজ। এতে সাহায্য করেছেন অচিন্ত্য রায়। আলোক সজ্জা— সঞ্জয় মাহাতো ও রূপসজ্জায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০ দিন ব্যাপী নাট্য প্রতিযোগিতায় দিল্লি, পুনে, কলকাতার নানান জলের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পেরে জলপাইগুড়িও খুব খুশি।

রঙ্গন রায়

বই পত্রের ডুয়ার্স

গৌতম গুহ রায় সম্পাদিত ‘দ্যোতনা’ প্রকাশিত হচ্ছে ৩৭ বছর ধরে। কিছুদিন আগে প্রকাশ পেয়েছে নতুন সংখ্যা। বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে। বিশেষ করে দুই বাংলার সাহিত্য-

সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে। দ্যোতনার নতুন সংখ্যার বিষয়বস্তু ‘অবিভক্ত বাঙালি সত্তার প্রতিবেদন’। উৎপলকুমার বসুকে নিয়ে তিনটি রচনা, তানভীর মোকাম্মেলের সাক্ষাৎকার, গল্প, কবিতা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র। চারটি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আছে, যেগুলির বিষয়বস্তু বোর্হেস, মালার্মে, মার্কেজ প্রমুখ সাহিত্যিক। স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে পাওয়া যাবে আরও দু’টি প্রবন্ধ। আবুবকর সিদ্দিককে নিয়ে একটি লেখা এবং তাঁর সাক্ষাৎকার। সব মিলিয়ে সিরিয়াস পাঠকের কাছে বেশ ভাল লাগবে ‘দ্যোতনা’র নতুন সংখ্যা।

নির্মল দাসের স্মৃতিচারণ করেছেন রণজিৎ মিত্র। উত্তরবঙ্গের ভাষা বিরোধের চরম মুহূর্তে নির্মলবাবুর আন্তরিক অথচ যুক্তিপূর্ণ রচনাগুলি বিরোধ প্রশমনে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। সাদ কামালী একটি ছোট্ট রচনা লিখেছেন শহিদ কাদরিকে নিয়ে। সৈয়দ শামসুল হকের কথা লিখেছেন পবিত্র সরকার এবং বেলাল চৌধুরী।

নবীন লেখকদের জন্য সুন্দর একটি রচনা লিখেছেন দেবেশ রায়। নাম ‘লেখালিখির বাধা বিপত্তি’। বাংলার নবীন লেখকদের কাছে বিশ্বকে জানার ও বোঝার সুযোগ অনেক বেড়েছে, কিন্তু তাঁদের কাছে এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবী কেবলই তথ্য? বাংলা ভাষা, দেশ এবং জাতি নিয়ে বাণীপ্রসন্ন মিশ্রর দীর্ঘ লেখাটি তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয়। এই দু’টি রচনা মুদ্রিত করার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে ক্রোড়পত্রটি শুরু হয়েছে লেখিকার ‘শবরতীর্থ’ রচনাটির পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্রর লেখার পাশাপাশি সম্পাদক লিখেছেন ‘প্রান্তজনের কথোয়াল’। সব মিলিয়ে ‘দ্যোতনা’ বিগত কয়েক বছরের সংখ্যাগুলির মতোই বৈচিত্রপূর্ণ।

কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কিত রাজা-রানি-মানুষ-স্থান-নদী-মন্দির-ঘটনা প্রভৃতি হরেক বিষয় নিয়ে একটি ‘কোষগ্রন্থ’ রচনা করেছেন অভিজিৎ রায়। উক্ত রাজ্য নিয়ে বহু বিষয়ের চটজলদি ধারণা লাভ করা যায় গ্রন্থটি থেকে। কোচবিহার চর্চাকারীদের জন্য এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজন যথেষ্ট। বইটি পড়তে শুরু করলে কোচবিহার ইতিহাসের অজস্র টুকরো টুকরো মুহূর্ত ভেসে ওঠে পাঠকের সামনে। ভেসে ওঠে কত নাম, চরিত্র! কে গণেশ গিরি, কে কণ্ঠভূষণ, রিপুঞ্জয় চক্রবর্তীই বা কে! বাঘ দুয়ার কোনটা, পিঞ্জারির ঝাড় কী বস্তু— এমন অনেক তথ্য সহজেই পেয়ে যাবেন পাঠকরা। অভিজিৎবাবু সাবলীল ভাষাতে, সংক্ষেপে একটা ধারণা তৈরি করে দিতে পেরেছেন কোচবিহার সাম্রাজ্য সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের সঙ্গে।

বইটিতে কয়েকটি পুরনো মানচিত্র ছাপা হয়েছে। এগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাজে

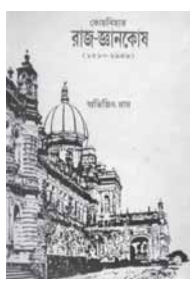

লাগবে। ১৭০ পাতার বইটি থেকে ১৫১০ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত অস্তিত্ববান কোচবিহার রাজ্যের বৈচিত্র, গুরুত্ব ও ব্যাপ্তির ছায়া স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। সঙ্গে কোচবিহার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা থাকলে আরও ভাল হত।

মাথাভাঙার ‘বিবৃতি’ পত্রিকার একাদশ বর্ষপূর্তিতে গত বছর প্রকাশিত হয়েছে দেবাশিস দাসের সম্পাদনায় ‘মাথাভাঙ্গা টাউন কমিটি থেকে পৌরসভার ইতিহাস’। বর্তমানে কোচবিহার জেলার মহকুমা হিসেবে মাথাভাঙা ১৯৫০ পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের একটি ছোট শহর ছিল। এর পর রাজ-আমলের টাউন কমিটি দ্বারাই শহরটির পুরব্যবস্থা পরিচালনা করা হত। ১৯৮৬ সালে সেই কমিটিকে পুরসভায় উন্নীত করা হয়। উল্লেখ্য যে, রাজ্য কোচবিহারের পাঁচটি টাউন কমিটির সব ক’টি কালক্রমে পুরসভায় পরিণত হয়।

সম্পাদকীয় এবং আনন্দগোপাল ঘোষের ভূমিকা ছাড়া মোট দু’টি দীর্ঘ রচনা মুদ্রিত হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যায়। রাজ-আমলের টাউন কমিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজর্ষি বিশ্বাস। স্বাধীনতার টাউন কমিটি থেকে পুরসভা হয়ে ওঠার বৃত্তান্তটি লিখেছেন জয়ন্ত গুহঠাকুরতা। রাজর্ষিবাবু কবুল করেছেন যে, মাথাভাঙা কবে ও

কীভাবে গড়ে উঠল, তার কোনও খবর নেই। মাথাভাঙা নামটি নিয়েও প্রচুর রহস্য আছে। দু’টি রচনা পড়ার পর মনে হল, মাথাভাঙা টাউন কমিটির প্রথম যুগের কাজকর্মের তথ্য খুব একটা পাওয়া যায়নি। তুলনায় শেষ পঁচিশ-তিরিশ বছরের তথ্যই বেশি উঠে এসেছে লেখকের আলোচনায়। তবুও লেখক যত্নের সঙ্গে মাথাভাঙা শহরের পুরনো চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেটুকু পাওয়া গিয়েছে, সেটাও কম নয়।

পুরনো দিনের মাথাভাঙা ছোট হলেও সাজানো-গোছানো শহর ছিল। এখন অবশ্য সে মাথাভাঙা হারিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটিতে বদলে যাওয়া মাথাভাঙার ইতিহাস সহজেই অনুমান করতে পারবেন পাঠকরা। শহর বেড়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু কোন ফাঁকে হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের সূত্রগুলি। লেখা দু’টি পড়ে মনে হল যে, ১৮৭০-এর পর থেকে মাথাভাঙা ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

পুরনো মাথাভাঙার বর্ণনা অনুযায়ী একটি কাল্পনিক মানচিত্র বড় করে ছাপা দরকার ছিল এই বইতে। ছাপা হওয়া ১৯৫০ সালের মানচিত্রটির আকার বড় হলে ভাল হত। টাউন কমিটির পুরনো অফিসঘরের কোনও ছবি না পাওয়াতে স্মৃতি থেকে আঁকা একটি ছবি ছাপা হয়েছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি ছবি ছাপা হলে পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তি পেত নিঃসন্দেহে। তবে, ‘বিবৃতি’ পত্রিকার এই প্রচেষ্টা অবশ্যই তারিফযোগ্য। কোচবিহারের টাউন কমিটিগুলির ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা হলে যে কোচবিহার রাজ্যের অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে, তা বলাই বাহুল্য।

দ্যোতনা। সম্পাদক গৌতম গুহ রায়। জলপাইগুড়ি। ২০০ টাকা। **কোচবিহার রাজ জ্ঞানকোষ**। অভিজিৎ রায়। অণিমা প্রকাশনী। কলকাতা- ৯। ৮০ টাকা। **মাথাভাঙ্গা টাউন কমিটি থেকে পৌরসভার ইতিহাস**। দেবাশিস দাস সম্পাদিত। মাথাভাঙা। ১০০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

খুচরো ডুয়ার্স

রয়েল বেঙ্গল সুহাস্য

শিলিগুড়ির কাছে বেঙ্গল সাফারি পার্কে বিশ হেক্টরের বাসভূমি জুটেছে বাঘুদার। সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন। চারপাশের পরিবেশ বেশ চমৎকার। তাই বাঘুদা স্নেহাশিস বেশ খোশমেজাজে দর্শনপ্রার্থীদের দেখা দিয়ে লেজ নেড়ে আশীর্বাদ করছেন। হালুম করে

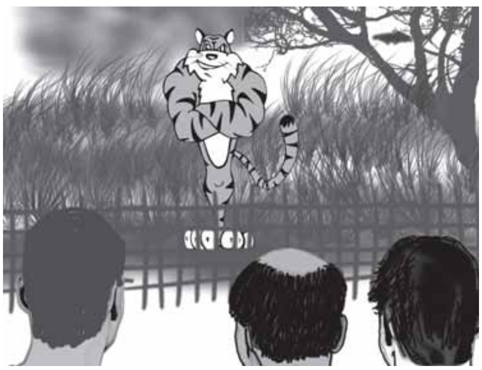

টুকটাক উপদেশ দিচ্ছেন। বাঘ দেখে লোকজন খুশি! তবে হ্যাঁ! বাসস্থানের কাছে গেলেন আর তিনি দেখা দিলেন— এ তো হতে পারে না! তাই পেশেন্স নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ভবিষ্যতে বাঘুদা রয়েল বেঙ্গল বউদিকে নিয়েও দেখা দেবেন। দিনকয়েক আগে বহুকাল পর লাভা যাওয়ার পথে একটা প্রাকৃতিক বাঘুদার দেখা পেয়েছেন একজন। ছবিও তুলে ফেলেছিলেন। পরে তার চরণচিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়। সেই থেকে বলাবলি হচ্ছে, আরে ভাই! বাঘই বাঘকে টেনে আনে। এবার দেখিস, হাসিমুখে বাঘুদারা একে একে ডুয়ার্সে উপস্থিত হল বলে!

ঠাস

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় হাসি-হাসিমুখে অতিথিরা হাজির। মাইক রেডি। এইবার 'নির্মল গ্রাম' হয়ে ওঠার শুভ ঘোষণা শুরু হল বলে। এমন সময় 'ঠাস!' সে কী? বোমা ফাটল, না গুলি চলল, না টায়ার পাংচার হল? শব্দটা মঞ্চের কাছ থেকে এল না? আরে না কাকা! বোমা-টায়ার-গুলি-পটকা নয়কো! ও তো চড় মারার শব্দ। এক মাঠ লোকের সামনেই পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের গালে হেভিওয়েট চড় বসিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েতেরই এক সদস্য। চপেটাঘাত উপহার পাওয়ার পর একদিন হতভম্ব থেকে পরদিন থানায় রিপোর্ট লেখালেন উপপ্রধান। সদস্য গ্রেপ্তার এবং জামিনে ছাড়া। কিন্তু নির্মল গ্রাম হওয়ার আনন্দে অমন বাঘা থাপ্পড় কেন রে বাপু? সদস্য বলছে, উপপ্রধান নাকি মঞ্চের সামনে তাঁকে দেখে বেজায় গাল দিতে শুরু করেছিল। তাই পালটা দশজনের সামনে 'ঠাস' দিয়েছে! হুম!

হাট হাটাও

এইরকমই একটা অভিযান চলছে যেন ওদলাবাড়ির হাটে। দুমদাম দালান তুলে দিচ্ছে কারা জানি! পটাপট দখল হয়ে যাচ্ছে হাটের জমি। পসরা নিয়ে বসা ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন জায়গা হারাচ্ছেন সেখানে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে যে, হাট তুলে দিয়ে সেখানে গ্রাম বসানো হবে। উপগ্রাম যাকে বলে! কিন্তু মামা! এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। ওদলাবাড়ির হাট হল গিয়ে পশ্চিম ডুয়ার্সের সেরা হাট। হাট লাটে তুলে ঘরবাড়ি বানায় কী করে? শুনে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাপতি নূরজাহান ম্যাডাম নাকি বলেছেন, রোসো! লোক পাঠিয়ে দেখছি কে কোথায় বিল্ডিং বানিয়েছে। দরকারে সব ভেঙে দেব! বেশ। আমরা ভাঙনের অপেক্ষায় রইলাম।

পিপীলিকাণ্ড

কাদোবাড়ি গ্রামের গেরস্তের ছিল একজোড়া বলদ আর আধ ডজন ছাগল। সবাই বড় প্রিয় গেরস্তের। কিন্তু সারাদিন কাজের পর গোবেচারা দু'টি যে একটু শান্তিতে ঘুমাবে, তার জো নেই! গোটা রাত্তির ছটফট করবে, ডাকাডাকি করবে! কিন্তু কেন? গেরস্ত সরেজমিনে তদন্ত করে জানতে পারলেন, এর জন্য অলপ্পেয়ে পিঁপড়ের দলই দায়ী। কেমন সার বেঁধে গোয়ালঘরের দেয়াল বেয়ে যাচ্ছে দেখ! রেগে আগুন তেলে বেগুন গেরস্ত তক্ষুনি কেরোসিন ঢেলে দিলেন আগুন লাগিয়ে। পুড়ে মর ব্যাটা খুদে বিচ্ছুর দল। তা আগুন তো জ্বলল। তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোয়ালঘর সমেত ভস্ম হয়ে গেল গেরস্তের বাড়ি। সঙ্গে ছাগলের দল সহমরণে। অবশ্যি তার জন্য খুব একটা চিন্তিত নন গেরস্তমশাই! বাড়ি ছাই তো কী হয়েছে? বলদগুলো তো এবার শান্তিতে ঘুমাতে পারবে! ঠিকই তো!

নব নৈব

বছর পনোরা রাজত্ব চালিয়ে ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুবাবু যেই নতুন ঝাঁ-চকচকে ঘরে আপিস নিয়ে এলেন, অমনি দিদি তাঁকে 'গুড বাই' বলে দিলেন! তারপর তো এলেন দুলালবাবু। নতুন আপিসে তিনি বসার পর কে জানি বলল যে, সে ঘর বাস্তুশাস্ত্র মেনে করা হয়নি। দুলালবাবু পাত্তা দিতে না চাইলও মাসখানেক পর তিনিও দিদির গুড বুকে যাওয়ার বদলে গুড বাই হয়ে গেলেন। এর পর এলেন নীহারবাবু। কিন্তু তিনি আগে থেকেই টের পেয়ে গিয়েছেন যে পুরপ্রধানের জন্য তৈরি ওই নয়া আপিসটাই হল অপয়া। বসতে হলে পুরনো ঘরেই বসবেন তিনি। দুলাল তো নতুন ঘরের চেয়ার-টেবিল বাস্তুমতে সাজিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেনি। অতএব নয়া ঘরে নৈব নৈব চ। সব শুনে কারা জানি বলছে যে, পুরনো ঘরে কৃষ্ণেন্দু পনেরো বছর ছিল যখন, নীহার কি পনেরো মাস থাকবে না? কে জানে ভাই! আগে তো পনেরো দিন কাটুক!

হস্তী কন্নড়

ডুয়ার্সের বিচ্ছু হাতিদের জন্য এবার জব্বর স্টেপ নিচ্ছে বন বিভাগ। কর্ণাটক থেকে পনেরোটা কুনকি নিয়ে আসছে তারা। অসভ্য, বখে যাওয়া গুন্ডা হাতিদের জব্দ

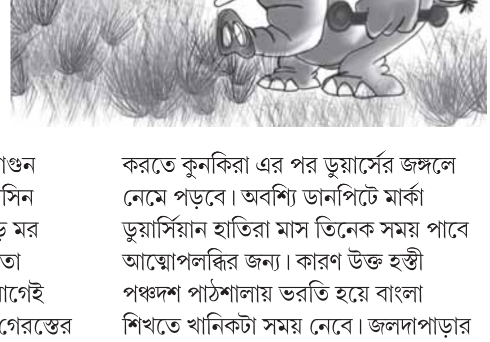

করতে কুনকিরা এর পর ডুয়ার্সের জঙ্গলে নেমে পড়বে। অবশ্যি ডানপিটে মার্কা ডুয়ার্সিয়ান হাতিরা মাস তিনেক সময় পাবে আত্মোপলব্ধির জন্য। কারণ উক্ত হস্তী পঞ্চদশ পাঠশালায় ভরতি হয়ে বাংলা শিখতে খানিকটা সময় নেবে। জলদাপাড়ার

কাছেই পাঠশালার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে ডুয়ার্সে এসে কর্ণাটকের হাতিদের আবার পাঁচ পা গজিয়ে গেলে মুশকিল। তাই কয়েকজন মাহুতও এসে থাকবে সে রাজ্য থেকে। গোপন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, খবর পেয়ে ডুয়ার্সের হস্তী ডনেরা গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। তাঁরাও নাকি দাঁতে ধার দেওয়া শুরু করেছেন এবং শুঁড় দিয়ে 'ওয়েট' তুলছেন।

খগণনা

খগ গুনতে গিয়ে ভারী সমস্যা। গজলডোবায়। কথা হল যে, পাখি আসে কত? এর মধ্যেই দুটো সংস্থা আলাদাভাবে গুনতে এসে যা বলেছে, তাতে প্রজাতির

সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও গুনে বেরিয়েছে হাজারখানেক। শোনার পর পক্ষীপ্রেমীরা হাহাকার করে বলছেন যে, বছর তিনেক আগেও গুনে পাওয়া গিয়েছিল হাজার পঞ্চাশেক। এর মধ্যে এত কমে কী করে? মাইক বাজানো, পিকনিক — সব তো বন্ধ গজলডোবায়! তবে? নির্ঘাত কোথাও ভুল হয়েছে! এটা শোনার পর আরেক দল বলছে, কিস্‌সু ভুল হয়নি। পিকনিক না হয় থেমেছে, কিন্তু পাশের সেনাঘাঁটিতে নিত্য কামান ছোড়া প্র্যাকটিস হয়। গোলা এসে পড়ে জলে। এর পরেও হাজারটা পাখি আছে মানে ভাগ্যের ব্যাপার। সত্যিই সমস্যা! এ-ও জানা যাচ্ছে যে, হাঁস পাখিদের রাতের বেলা মেরে রোস্ট করার জন্য হোটেলে চড়া দামে বেচে দেয় অনেকে। কী নচ্ছার!

হাতি দিন

পর্যটন দপ্তর হাতি কেনার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে গো! কত্ত কত্ত পর্যটক হাতির অভাবে জঙ্গল সাফারি না করেই গোমড়া মুখে ফিরে যায়। দেখে আপশোস হয় গৌতমের। ভাবেন, আহা! বন বিভাগের মতো যদি আমাদের হাতি থাকত কয়েকটা! লাভের কড়ি আরও বেশি উপচে পড়ত তবে। কিন্তু হাতি কেনা আবার চাট্টিখানি কথা নয়। বাজারে গেলুম, কড়ি ফেললুম আর হাতি নিলুম— এ হওয়ার নয়। বন দপ্তরের অনুমতি নিতে হবে। তা গৌতমবাবু হাতির দাম তো বটেই, মাহুতের মাইনে, এমনকি হাতির খোরাকের পয়সা দিতে এক পায়ে রাজি হলেও বন বিভাগ কোনও সাড়াশব্দ করছে না। বিনয়বাবু বলে দিয়েছেন, খামকা হাতি কিনতে যাবি কেন রে গৌতম? তোকে জলদি জলদি কিছু দক্ষিণ ভারতীয় হাতি এনে দেব। দেখিস, কী সার্ভিস দেয়!

আল ইজ ফেইল

কী বাজে! কী খারাপ! উত্তরের সাত সাতটা জেলা, আর সব ক'টাই ফেল করল গো! ১০০ দিনের কাজে জেলাদের ডেকে ডেকে ফেল করিয়ে দিল সরকারের রিপোর্ট! কেবল দার্জিলিংবাবুর স্কোর চল্লিশ পেরিয়েছে, মানে একচল্লিশ দিনের কাজ করিয়েছে, বাকি সব থার্ড ডিভিশন। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি মোটে ২৯ দিন! একে ফেল করা ছাড়া আর কী বলা যায়? তা সাত জেলার সাত পরিষদের সাত সভাপতি অবশ্য হরেক কারণ দেখাতে দেরি করেননি। বেশির ভাগই বলেছেন, কেন্দ্র টাকা না দিলে কাজ হবে কী করে? তা দিনমজুররা বিলক্ষণ রেগে আছেন বলেও শোনা গেল। শাসকদলের লোকজন দাবি করেছেন যে, জেলারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র। মোদি মাস্টর জোর করে ফেল করিয়ে দিয়েছে।

গীতিভিক্ষা

নোট বাতিলের পর পাবলিক ভিক্ষে দেওয়া প্রায় বন্ধ করেই দিয়েছিল। ভারী ফাঁপরে পড়েছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের ভিক্ষুকরা। অনেক চিন্তাভাবনা করে শেষে নিজেদের অবস্থা নিয়ে সমবেত উদ্যোগে গান লিখে, সুর দিয়ে, রিহার্সাল করে পথেঘাটে কোরাস

গাইতে শুরু করলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ। গান শুনে অভিভূত হয়ে টপাটপ দু'টাকা, এক টাকা, পাঁচ টাকা দিতে শুরু করলেন শ্রোতারা। ভাগ্যিস নোট হয়েছিল লুপ্ত! নচেৎ কীভাবে জাগত প্রতিভা সুপ্ত? শোনা যাচ্ছে, কথানির্ভর ভিক্ষের তুলনায় গীতিনির্ভর ভিক্ষে অনেক বেশি কাজে দিচ্ছে এখন।

ডানহাতি লেফ্‌ট হ্যান্ড

প্রায় এমনই ব্যাপার গো! ধূপগুড়িতে পুলিশের নির্দেশ পড়ে পাবলিকের এমনই ধাঁধা লেগেছে। জমাটি ফালাকাটা রোডে বোর্ড লাগিয়ে লিখে দিয়েছে— 'যানবাহন দাঁড়াইবে না।' আবার দু'পা হাঁটলেই চোখে পড়ছে 'মোটরসাইকেল পার্কিং জোন'। এ তো ভারী সমস্যা। দুয়ে মিলে যা দাঁড়াচ্ছে তা হল, পার্কিং কিন্তু পার্কিং নয়। গাড়ি দাঁড়াইবে এবং দাঁড়াইবে না। তবে যে পণ্ডিতরা বলে থাকেন, একই বস্তু একই সঙ্গে সাদা আর কালো হতে পারে না? কর্তৃপক্ষ অবশ্যি বলছেন যে, ফালাকাটা রোডে গাড়ি পার্কিং সদাই অস্থায়ী। তাই এমন গোলমেলে দেখাচ্ছে। জলদি মিটে যাবে সব। তা, না-মেটা পর্যন্ত কী করি কাকা? গাড়িটা রাখব এবং রাখব না?

টুক্রাণু

ডুয়ার্সের নদীসেতুরা অচিরেই সৌরবিদ্যুতে চমকাবে। বাসিন্দাদের তাজ্জব করে ডুয়ার্সের গ্রামে চলছে এনবিএসটিসি-র বাস। শীতবুড়ির ভীমরতিতে মধ্যমাঘে ডুয়ার্সের তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি। মালদার কিংবদন্তি জাল নোট করিডর দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'হাজার টাকার জাল নোট। পানীয় জলের আশঙ্কাজনক অপচয় ধূপগুড়ি পুর এলাকায়। ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে ডুয়ার্সে কলেজ ভোট শেষ করল টিএমসিপি। বীরপাড়ার লঙ্কা রোড পথবাতির 'অন্ধকারে' শঙ্কা রোডে পরিণত হয়েছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য এসে চা-বাগান দেখে দিদির ঘাড়ে একগুচ্ছ দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। পুরসভার উপহার ফিরিয়ে ভাতা পাচ্ছেন না জলপাইগুড়ির কাউন্সিলর অম্লানবাবু। কামরূপ এক্সপ্রেসের এসি টু-টিয়ারে শিলিগুড়ির অশোকবাবুর মোবাইল ফোন পকেটমার। রুট বেঁধে দিতেই চটে লাল দিনহাটার টোটোচালকরা। ময়নাগুড়ির ব্যাংকান্দি গ্রামে সোদরখই এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের জোর দাবি।

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৩। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-11 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

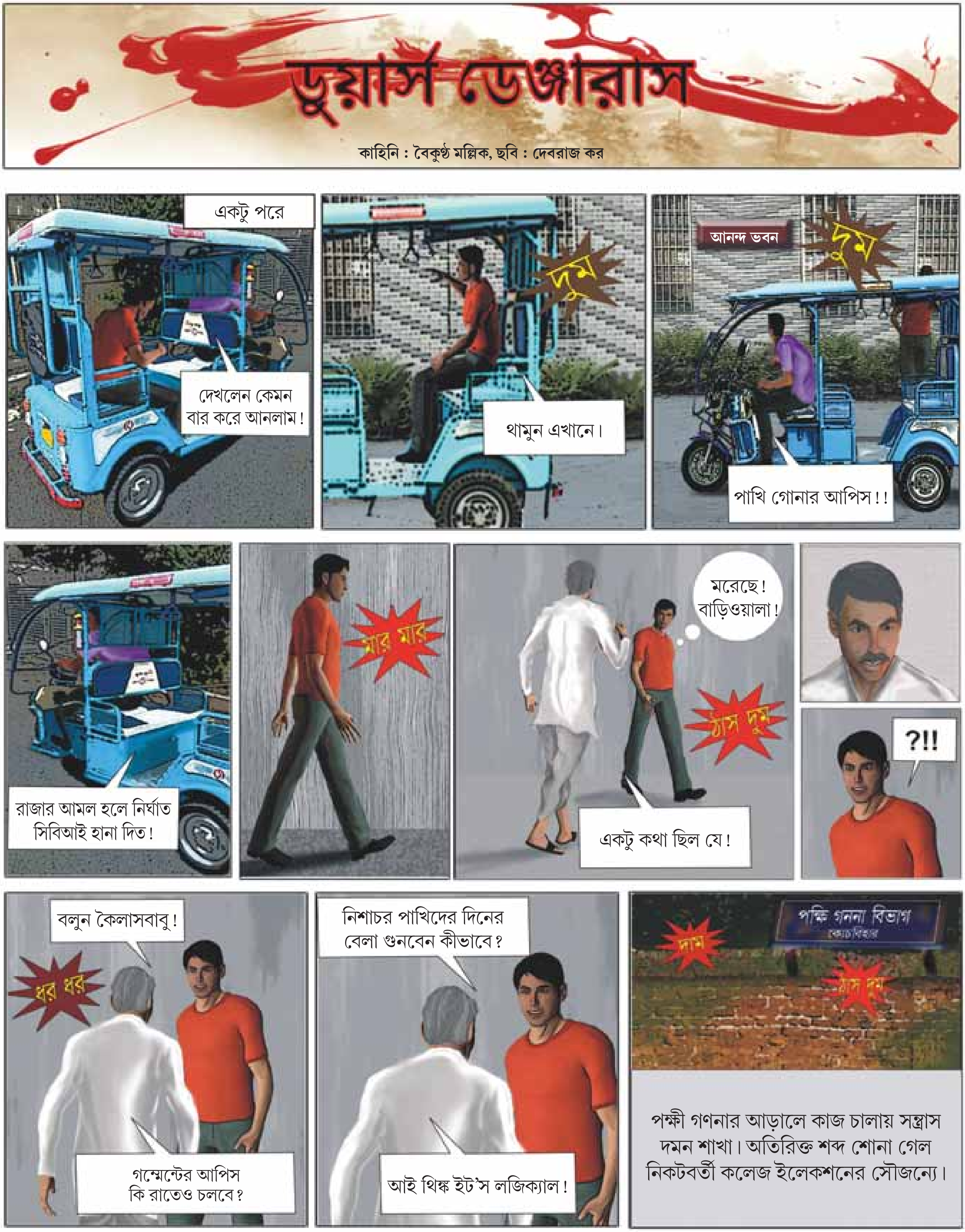

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.